বেঙ্গল টাইমস
২৪ জুলাই, ২০২৬

এখনও উত্তম

ISSN 2445 5657
bengaltimes.in

সূচিপত্র

তিনটি প্রশ্ন থেকেই গেল
❑ কুণাল দাশগুপ্ত

হিন্দিতে অগ্নীশ্বর করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ!
❑ অমিত ভট্টাচার্য

হাতে আসা সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন
❑ সত্রাজিৎ চ্যাটার্জি

শুধুই উত্তম! বাকিদের ভুলে যাবেন!
❑ সরল বিশ্বাস

কজন ডাক্তার অগ্নীশ্বর দেখেছেন?
❑ সজল মুখার্জি

শুটিং দেখার টুকরো টুকরো স্মৃতি
❑ বিশ্বরঞ্জন দাশগুপ্ত

মহা–কমেডিয়ান
❑ ময়ূখ নস্কর

মহা–খলনায়ক
❑ দিব্যেন্দু দে

নন্দ ঘোষের কড়চা
সব ট্রফি ইস্টবেঙ্গলকেই দিচ্ছো

একটি রাত এবং একা উত্তম কুমার
❑ অম্লান রায়চৌধুরী

অন্য এক যুগলবন্দি
❑ পৃথা কুণ্ডু

বলিউডকেও পথ দেখিয়েছিলেন
❑ বৃষ্টি চৌধুরি

হলে গিয়ে উত্তমের ছবি দেখেছেন?
❑ রাজেশ মুখার্জি

উত্তম–মুনমুন জুটি হয়েও হল না
❑ শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন যে মহালয়া করতে গেলেন!
❑ দিব্যেন্দু দে

আর কলকাতায় ফিরতেই চাননি!
❑ রজত সেনগুপ্ত

তার ছিঁড়ে গেছে কবে!
❑ স্বরূপ গোস্বামী

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কে বি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। আই এস এস এন: ২৪৪৫–৫৬৫৭। ফোন: ০৩৩ ৪০৬৪৫৭৯৮/৯৮৩১২২৭২০১।
ই মেল: bengaltimes.in@gmail.com ওয়েবসাইট: bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

উত্তম কুমারের জন্মদিন কবে? এই নিয়ে একটা সমীক্ষা হয়ে যাক। অনেকেই হয়ত বলবেন, জুলাই মাসে। আসলে, মৃত্যুর মাসটা এত বেশি প্রচারিত, জন্মমাস চাপা পড়ে গেছে। ঠিক তেমনই, মহানায়কের জীবনের অনেক কিছুই চাপা পড়ে গেছে অন্য কোনও জনপ্রিয় প্রচারের আড়ালে। যেমন উত্তম বললেই বাঙালি বলে ওঠে, উত্তম –সুচিত্রা। অথচ, যে কয়েকটা ছবিতে এই দুজন অভিনয় করেছেন, তার অধিকাংশ ছবির পোস্টারে উত্তম–সুচিত্রা লেখা নেই। আছে সুচিত্রা–উত্তম। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। শেষ ১৮ বছরে এই জুটির ছবি মাত্র ৬ টি। সুপ্রিয়া বা সাবিত্রীর সঙ্গেও কিন্তু প্রায় সমান সংখ্যক বা বেশি ছবি করেছেন। কিন্তু সুচিত্রা নামটার আড়ালে তাঁরাও যেন চাপা পড়ে গেলেন। উত্তম মানেই নাকি হেমন্তর কণ্ঠ। কিন্তু সে তো প্রথম কয়েক বছর। পরের দিকে শ্যামল, মান্না, কিশোরের গানও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তবু উঠে আসে হেমন্তর নামটাই। উত্তম মানেই শুধু রোমান্টিক নায়ক! খলনায়কের চরিত্রে বা হাসির ছবিতেও কিন্তু সমান উজ্জ্বল। কিন্তু ওই যে, মহানায়ক ইমেজের কাছে চাপা পড়ে গেল ওই চরিত্রগুলো।

কেন শুরুতে মুম্বইয়ের ডাক পেয়েও যাননি? পরে গেলেও কেন সেভাবে সফল হলেন না? কেন বড় মাপের পরিচালকদের সঙ্গে সেভাবে কাজ করার সুযোগ হল না? এমন নানা উপাখ্যান উঠে এসেছে বিভিন্ন লেখায়। আরও অনেক বিষয় তুলে ধরা যেত। প্রথমত, সময় অল্প। দ্বিতীয়ত, কোথাও একটা থামতে হয়। যাঁরা মহানায়ক নিয়ে অনেককিছু জানেন, তাঁদের কাছে হয়ত এগুলো জানা ঘটনা। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অনুরাগী আছেন, যাঁরা হয়ত অনেক নতুন তথ্য ও ঘটনার হদিশ পাবেন। মূলত, তাঁদের জন্যই এই প্রয়াস।

শ্রেষ্ঠত্বের মাঝেও ওই তিনটি প্রশ্ন থেকেই গেল

উত্তম কুমারের মৃত্যুদিন বহুচর্চিত। কিন্তু জন্মদিন কেন সাদা কালো? উত্তমের নায়িকা বলতে সুচিত্রা বা সুপ্রিয়ার নাম ভেসে ওঠে। সাবিত্রীর মুখ কেন ভেসে ওঠে না? হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যদি পূব আকাশের উত্তমের গায়ক হন, যদি মাঝ আকাশে শ্যামল মিত্র–মান্না দে থাকেন, তাহলে শেষযাত্রার উত্তম কেন কিশোর কুমারে ভরপুর হবে না? তিন প্রশ্ন উস্কে দিলেন **কুণাল দাশগুপ্ত**।

কত ক্যালেন্ডার আসে যায়। ফি বছর নিয়ম করে। ৩ সেপ্টেম্বর সেঁটে থাকে শুধুমাত্র একটা সংখ্যা হয়ে। টালিগঞ্জে মহানায়কের মূর্তিতে মালা পরিয়ে নমো নমো করে লক্ষ্মীপুজো হয় মাত্র। উত্তম কুমারের জন্মদিনে রঙ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বরং, মৃত্যুদিনেই বর্ণময় উত্তম। উত্তম মানেই লোকে বোঝে জুলাই মাস। শেষ সপ্তাহে টিভি থেকে এফএম, ফেসবুক থেকে পাড়ার গুলতানিতে বয়ে উত্তম–ঝড়। কোনওদিন হলে গিয়ে উত্তমের কোনও ছবি না দেখা বাঙালিও হয়ে যান উত্তম বিশারদ। অথচ, সেপ্টেম্বরের শুরুতে এসব কিছুই চোখে পড়ে না।

অনেক অজানা রহস্যের মতো মহানায়ককে ঘিরে তিনটে রহস্যের কিনারা আজও পাওয়া যায়নি। ১) উত্তম কুমারের জন্মদিন কেন সাদা কালো? ২) বিপরীতে অভিনয় করার জন্য সুচিত্রা বা সুপ্রিয়ার বদলে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে আরও বেশি করে সামনে রাখা হল না কেন? ৩) হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যদি পূব আকাশের উত্তমের গায়ক হন, যদি মাঝ আকাশে শ্যামল মিত্র–মান্না দে থাকেন, তাহলে শেষযাত্রার উত্তম কেন কিশোর কুমারে ভরপুর হবে না?

কিংবদন্তিকে স্মরণ করার জন্য সাধারণত জন্মদিনকেই বেছে নেওয়া হয়। রবি ঠাকুর

থেকে কিশোর কুমার। পঁচিশে বৈশাখ কিংবা ৪ আগস্ট। যত ধুমধাম ওই জন্মদিন ঘিরেই। কিন্তু মহানায়কের নিষ্প্রভ জন্মদিন সব হিসেবপত্তরকে ওলট-পালট করে দেয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সারা বছর কত উৎসবে অথবা বে-উৎসবে কত গান বাজে। কিন্তু ৩ সেপ্টেম্বর নিশ্চুপ কেন? কেন নিস্তব্ধতা? ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস, আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা, বড় একা লাগে বা কী আশায় বাঁধি খেলাঘর কেন হঠাৎ করে ওই দিনটাতেই হারিয়ে যায়! উত্তর মেলে না।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। উত্তম মানে শুধু সুচিত্রা বা সুপ্রিয়ার ছবি নয়। নয় ওই দুই নায়িকার হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেখানে জাঁকিয়ে রাজ করে গেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। নয় নয় করে ৩৯ টি হিট ছবিতে। মৌচাক, গৃহদাহ, মরুতীর্থ হিংলাজ, ধন্যি মেয়ে, এমন কত সেলুলয়েড গানের স্পন্দন পেয়েছে। প্রেমেরও। 'অভিনয় নয়' হয়ে উঠেছে অসংখ্যবার। তবু সাবিত্রীকে তৃতীয় প্রধান হয়েই কাটিয়ে দিতে হল। দোষ কার? দর্শক না চিত্র সমালোচকদের? কে জানে?

ঠিক তেমনভাবেই, অবহেলিত কিশোর কুমারও। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উত্তমের গলার অদ্ভুত মিল ছিল। কিন্তু সেটা নেহাত কাকতালীয়। কারণ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দেবানন্দ বা বিশ্বজিতের গলার সঙ্গে খুব একটা মিলমিশ খায়নি হেমন্ত-কণ্ঠ। তবু গোড়ার দিকে বহু কালজয়ী গান রচিত হয়েছে এই দুজনকে ঘিরে। একটা সময় সেই জায়গায় এসেছেন শ্যামল মিত্র। দুই গলার মধ্যে বিস্তর তফাত। হেমন্ত কণ্ঠ আর শ্যামল কণ্ঠের মধ্যে পার্থক্যটা আসমান-জমিন। তাহলে মাঝে থাকা উত্তমের সঙ্গে শ্যামল কণ্ঠ মেলে কী করে? শ্যামল মিত্রর মায়াবী গলা শ্রোতা-দর্শককে এই বাছবিচার করার সুযোগ দেয়নি। যেমন দেয়নি মান্না দের গান। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, স্ত্রী বা সন্ন্যাসী রাজার মেজাজ মান্না দে ছাড়া ভূভারতে আর কার কাছেই বা পাওয়া যাবে?

শেষ লগ্নে কিন্তু উত্তম কুমারকে অক্সিজেন জুগিয়েছিলেন কিশোর কুমার। হ্যাঁ, সাতের দশকের শুরুর সবরমতী বা রাজকুমারী নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু অমানুষ, আনন্দ আশ্রম, বন্দি এমনকী ওগো বধূ সুন্দরী ছবিতে যে প্লে ব্যাক কিশোর কুমার করেছিলেন, তা নেপথ্য গায়কদের বর্ণ পরিচয় হিসেবে বেঁচে থাকবে। গানের ফাঁকে কিশোর কুমার যখন সংলাপ বলেছেন, মনে হয়েছে সে সংলাপ যেন উত্তমই বলছেন। এমনটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কিন্তু কিশোর কুমার এই কাণ্ডটি সব নায়কের ক্ষেত্রেই নিখুঁতভাবে ঘটিয়েছেন। তবু সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতোই কিশোর কুমারেরও জুটেছে একরাশ উপেক্ষা। ফল যেটা হয়েছে, তা হল, উত্তম কুমারের মূল্যায়নে বিস্তর বিচ্যুতি থেকে গেছে। হয়ত এর উত্তর পাওয়া যাবে একদিন। হয়ত যাবে না। হয়ত সপ্তর্ষি মণ্ডলের মতো ছায়াছবির আকাশে প্রশ্নচিহ্ন হয়েই বিরাজ করে যাবে অনন্তকাল।

হিন্দিতে অগ্নীশ্বর করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ!

অমিত ভট্টাচার্য

চেনা উত্তমকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন একেবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হয় সেটাই চেয়েছিলেন। তাই তাঁর তৈরি চারটি ছবিই একেবারে ভিন্নস্বাদের। বছর পাঁচেক আগেও এমন সময়েও বেঁচেছিলেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছিল। কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না। তবু মাঝে মাঝেই উকি দিয়ে যেত মহানায়কের স্মৃতি। এক সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ি। প্রসঙ্গ অবশ্যই উত্তম কুমার। এক প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছিলেন অন্য প্রসঙ্গে। তবে যা বলছিলেন, তার মধ্যে কোথাও কোনও অতিরঞ্জন নেই।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের আরও একটা পরিচয় আছে। তিনি সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) ভাই। উত্তমকে নিয়ে বানিয়েছেন চারটি সিনেমা। আর চারটিই একেবারে অন্য ঘরানার। সেই চারটি ছবি হল নিশিপদ্ম, অগ্নীশ্বর, ধন্যি মেয়ে ও মৌচাক। সে অর্থে নায়ক বলতে যা বোঝায়, এই চারটি ছবিতে তেমন ভূমিকায় আদৌ ছিলেন না মহানায়ক।

আলাপটা অনেকদিনের। অরবিন্দবাবু তখন সহকারী পরিচালক। বেশ কয়েকটা ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে।

স্টুডিওপাড়ায় অরবিন্দবাবুর ডাকনাম ছিল ঢুলু বাবু। উত্তম বলতেন, ঢুলুদা। তাঁর স্ক্রিপ্ট বেশ পছন্দ করতেন মহানায়ক।

তার আগে বেশ কয়েকটা ছবি করা হয়ে গিয়েছিল। কম বাজেটের ছবি। সাহস করে উত্তম কুমারকে বলতে পারেননি। অবশ্য পরিচালক হওয়ার স্বপ্নটা উস্কে দিয়েছিলেন উত্তমই, ‘আপনি কেন ছবি বানাচ্ছেন না? আর কতদিন সহকারী থাকবেন? এবার নিজে ছবি পরিচালনা করুন।’ কিছুটা সাহস পেয়েছিলেন ঢুলুবাবু। তাই বলে কি আর উত্তম কুমারকে বলা যায় ?

সাহস করে একদিন বলেই ফেললেন। বিভূতিভূষণের কাহিনি নিয়ে নিশিপদ্ম। যেখানে নায়ক মদ্যপান করে, অবৈধ নারীসঙ্গে আসক্ত। এমন চরিত্রে উত্তম কুমার! কিছুটা সংকোচ ছিল। বলেছিলেন, তোমাকে ওই চরিত্রে ভেবেছি। তুমি কি কাজ করবে? এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন উত্তম। তৈরি হল নিশিপদ্ম। পরে সেই কাহিনি নিয়েই হিন্দিতে ছবি বানিয়েছিলেন শক্তি সামন্ত। ছবির নাম অমর প্রেম, নায়ক রাজেশ খান্না।

এরপর অগ্নীশ্বর। উত্তমের জীবনের স্মরণীয় ছবিগুলির একটি। বেতার জগতের শারদীয়া সংখ্যায় বেরিয়েছিল বনফুলের এই গল্পটি। তখন থেকেই এই গল্প নিয়ে ছবি করার কথা ভেবে আসছিলেন ঢুলু বাবু।

কিন্তু এর চিত্রনাট্য তৈরি করা বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। পাঁচটি গল্পকে এক জায়গায় এনে চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ছবিটি দেখে অমিতাভ বচ্চন এতটাই অভিভূত ছিলেন, হিন্দিতে ওই ছবি করতে চেয়েছিলেন। অনেকদূর কথা এগিয়েওছিল। কিন্তু শেষমেষ আর হয়ে ওঠেনি।

ধন্যি মেয়ে। ফুটবল নিয়ে এমন একটা ছবি! চিত্রনাট্যের সেই লাইনগুলো মনে করুন, 'তোমার সংসারের পেনাল্টি বক্সে যে জ্যান্ত বলটা পাঠিয়েছি, তা চেষ্টা করেও কোনওদিন ফেরাতে পারবে না।' এটাও চিঠির ভাষা হতে পারে! এমন অভিনব কিছু সংলাপের জন্যই ছবিটা অন্য এক মাত্রা

পেয়েছে। নায়িকা হিসেবে জয়া ভাদুড়ির পথ চলা এই ছবি থেকেই।

সমরেশ বসুর কাহিনি নিয়ে এরপর করলেন মৌচাক। এখানে উত্তম হলেন রঞ্জিত মল্লিকের বড় দাদা। ছত্রে ছত্রে হাসির উপাদান। অরবিন্দবাবুর কথায়, হাসির ছবি করা কিন্তু সবথেকে কঠিন। দেখতে হবে, সেই হাসির মধ্যে যেন ভাঁড়ামি না এসে যায়।'

কথা ছিল, উত্তম-সুচিত্রা দুজনকে নিয়ে সমরেশ বসুর লেখা নাটের গুরু করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। উত্তম মারা যাওয়ার পর সঞ্জীব কুমারকে সঙ্গে নিয়ে সুচিত্রা সেনও নাকি অভিনয় করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাও আর হয়ে ওঠেনি।
টুকরো টুকরো অনেক কথা সেদিন বলেছিলেন বর্ষীয়াণ পরিচালক। যেমন দার্জিলিংয়ে 'পথে হল দেরী'র শুটিং। ঢুলুবাবু সহকারী পরিচালক। রাতে হোটেলে আড্ডা হচ্ছে। উত্তম কুমার বললেন, আজ আপনাকে ড্রিঙ্ক করিয়েই ছাড়ব।' ঢুলুবাবুর মুখেই শোনা যাক, 'আমি

পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। কখনও খাইনি। খাওয়ার ইচ্ছেও নেই। অথচ, সরাসরি উত্তমকে 'না' বলি কী করে? ও একটা গ্লাসে ঢেলে দিল। ওরা গল্পে মেতে রইল। দেখলাম, পিছন দিকে একটা পিকদানি। চুপি চুপি সেখানে ঢেলে দিলাম। আমার গ্লাস খালি দেখে উত্তম বলে উঠল, আরে, এর মধ্যে শেষ করে ফেলেছেন? করেছেন কী? তখন সত্যিটা বলেই ফেললাম। শুনে সুচিত্রার সে কী হাসি। বলল, আপনি তো দেখছি উত্তমের থেকেও বড় অভিনেতা। কাউকে কিছু বুঝতেই দিলেন না! তবে, আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না। এসব না খেলে এ লাইনে টিকবেন কী করে!' পুরানো দিনেই যেন ফিরে যাচ্ছিলেন বর্ষীয়াণ পরিচালক। মুখে অনাবিল হাসি। টুকরো টুকরো এমন কত স্মৃতি ভেসে উঠল।

সেই মানুষটা আর নেই। কয়েক বছর আগেই চিরতরে হারিয়ে গেলেন। কানে শুনতে না পেলেও যাঁর হৃদয়জুড়ে ছিলেন মহানায়ক। যিনি নায়কের গন্ডি ভেঙে একেবারে অন্য এক উত্তমকে হাজির করেছিলেন বাঙালির সামনে।

হাতে আসা সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন

বারবার সুযোগ এসেছে। কখনও নিজের সিদ্ধান্তে, কখনও অন্যের বুদ্ধিতে, বারবার সেই সুযোগ ফিরিয়ে দিয়েছেন। পরে বোঝা গেছে, সেই সিদ্ধান্তগুলো নিতান্তই ভুল ছিল। নিজেও বারবার আক্ষেপ করেছেন। সেদিন ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে উত্তম হয়ত 'সর্বোত্তম' হয়ে উঠতেই পারতেন। লিখেছেন সত্রাজিৎ চ্যাটার্জি।

বাঙালির 'মহানায়ক' তিনি। সব বয়সের মানুষের কাছে ম্যাটিনি আইডল। তা সত্ত্বেও কেন বলিউডে গিয়ে নিজের স্থায়ী জায়গা তো দূরের কথা, সেভাবে দাগ কাটতেই পারলেন না। নিজের ক্যারিয়ারে প্রায় ২৩০ টি ছবিতে মূলতঃ নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেও বরেণ্য বাঙালি পরিচালকদের সঙ্গে সেভাবে কাজ করার সুযোগ পেলেন না কেন? শেষ সময়ে নায়কের ভূমিকা ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন চরিত্রাভিনেতার ভূমিকা। কিন্তু অধিকাংশ ছায়াছবিই বাণিজ্যিকভাবে সফল নয়। কেন? একটু তলিয়ে দেখা যাক এইসব প্রশ্নের উত্তরগুলো।

আসলে উত্তম কুমার তাঁর অভিনয় জীবনের বিভিন্ন বাঁকে এসে নানা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সব যে এককভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, এমন নয় যদিও। তবে যে কোনও ভুল সবসময়ের জন্যই ভুল। অনেকে সময়ের দোহাই দিয়ে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে আক্ষেপ করতেই হয়। উত্তমকুমারের অভিনয় জীবনেও তেমনটাই হয়েছিল। একেবারে শুরুর দিকে প্রায় ১৫–১৬ টি ছবি বাণিজ্যিকভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়ার পরে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চাকুরিরত অরুণ কুমার চট্টোপ্যাধ্যায় মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। বাংলার অভিনয় জগতে তখন নায়কের ভূমিকায়

দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন বিকাশ রায়, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার প্রমুখেরা। এই কঠিন সময়ে সুধীর মুখার্জির শাপমোচন ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেলেন অরুণ কুমার ওরফে উত্তমকুমার। বিপরীতে সুচিত্রা সেন। তিনিও তখন নবাগতা। এই যুগল এর আগে নির্মল দে পরিচালিতে 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে অভিনয় করলেও সেখানে কিন্তু নায়ক--নায়িকার রোমান্টিসিজমের তেমন পরিসর ছিল না। বরং, অনেক বেশি হাসির ছবি। সেটা যত না উত্তম-সুচিত্রার, তার থেকে ঢের বেশি বোধ হয় তুলসী চক্রবর্তী-মলীনা দেবীর ছবি। তার পর ১৯৫৪ সালে মুক্তি পাওয়া 'বসু পরিবার' এও নায়ক-নায়িকার জুটি সেভাবে দানা বাঁধেনি। এর পর এল 'শাপমোচন'। এই ছবিতে উত্তম কুমারের লিপে গান করলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আশ্চর্য মিল পাওয়া গেল এই দুজনের কণ্ঠস্বরে। উত্তম কুমার নিজে প্রথাগত ভাবে গান শিখেছিলেন বলেই অসাধারণ লিপ দিলেন 'শাপমোচন'-এর গানগুলোতে। বাংলা ছবিতে শুরু হল এক নতুন নায়ক-গায়ক জুটির জয়যাত্রা। তার সঙ্গেই সুচিত্রা সেনের সঙ্গেও তৈরি হল এক রোমান্টিক জুটির জয়যাত্রা। সুচিত্রার লিপে গান করতেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সার্বিকভাবেই উত্তম-সুচিত্রা এবং হেমন্ত-সন্ধ্যা হয়ে উঠলেন একে অপরের পরিপূরক। শাপমোচনের পরে অগ্নিপরীক্ষা, সবার উপরে, পথে হলো দেরী, শিল্পী, চাওয়া পাওয়া, সূর্যতোরণ, ইন্দ্রাণী, হারানো সুর, সপ্তপদী- এসব একের পর সুপারহিট ছবি। উত্তম-সুচিত্রা জুটি তখন বাংলা ছবিতে সোনা ফলাচ্ছে। একের পর এক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একের পর এক মন-

মাতানো গান করছেন উত্তমের লিপে। সার্বিকভাবেই উত্তমের অভিনয় জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল।

এরপর আসি ভুলের কথায়। উত্তমকুমারের ভুলের সূত্রপাতটাও কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া না দিয়েই। প্রথমতঃ মৃণাল সেনের "নীল আকাশের নীচে" তে চীনা ফেরিওয়ালার চরিত্রে কাজ করতে রাজি হয়েও পরে পিছিয়ে যান। শোনা যায়, চীনাদের আদবকায়দা রপ্ত করার মতো সময় ছিল না। ওই চরিত্রের জন্য নাকি প্রায় তিন ঘণ্টার মেক আপ করতে হত, মহানায়কের ব্যস্ত সিডিউলে এত সময় কোথায়! ফলে, এই ছবির কাজটা ছাড়তে হয়েছিল। ছবির প্রযোজক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। উত্তম কুমারের পরিবর্তে সেই চীনা ফেরিওয়ালার চরিত্রে নেওয়া হয়েছিল কালী ব্যানার্জিকে। বাকিটা ইতিহাস। 'নীল আকাশের নীচে' শুধু বাণিজ্যিকভাবেই সফল নয়, তা নবাগত পরিচালক মৃণাল সেনকেও পায়ের তলায় দিয়েছিল শক্ত মাটি। উত্তম এই ছবিতে অভিনয় না করে মৃণাল সেনের সঙ্গে দারুণ একটি ছবিতে কাজ করার সুযোগ হারিয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য উত্তম কুমার মৃণাল সেনের পরিচালক জীবনের প্রথম ছবি 'রাতভোর' এ অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু সিনেমাটা একেবারেই চলেনি। 'নীল

আকাশের নীচে’ তে কাজ না করার পরে আমৃত্যু উত্তম কুমার আর মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাননি, এমনকি সত্যজিৎ রায়ের ‘নায়ক’– অভিনয় করে “মহানায়ক” হওয়ার পরেও।

এর পরের ভুলটা আরও মারাত্মক। বাংলা ছবিতে হেমন্ত–উত্তম জুটি তখন জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। আর বাংলার বাইরে সুদূর আরবসাগরের তীরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ওরফে হেমন্তকুমার তখন হিন্দি ছবির জগতে অন্যতম সফল কণ্ঠশিল্পী এবং সঙ্গীত পরিচালক। এই অবস্থায় হেমন্ত ভেবেছিলেন গান গাওয়া এবং সুরারোপ করার পাশাপাশি ভাল মানের ছবি প্রযোজনা করবেন। ‘গীতাঞ্জলি পিকচার্স’ নামে এই সংস্থা ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজক সংস্থার নাম। এই সংস্থার প্রথম ছবি ঠিক হয়েছিল ‘শর্মিলা’। যাতে হেমন্ত চেয়েছিলেন উত্তম কুমারকে। কথাবার্তাও পাকা হয়ে গিয়েছিল। সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে পাতাজোড়া ঢাউস বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এই ছবি থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, উত্তম কুমার তখনই হিন্দি ছবিতে কাজ করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন না। অনেকে মনে করেন, উত্তম কুমার প্রযোজক হিসেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে তেমন ভরসা করতে পারেননি। যদি ছবি ফ্লপ হয়, তাহলে তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়বে। যে কারণেই হোক, এই ভুলের খেসারত দিতে হয়েছিল তাঁকে আমৃত্যু। উত্তম আচমকা নিমরাজি হওয়ায় প্রযোজক হেমন্তর বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। দুজনের সম্পর্কেও কিছুটা চিড় ধরেছিল। শেষমেষ ‘শর্মিলা’ ছবিটাই আর হল না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পরে তাঁর প্রযোজনায় তৈরি করলেন ‘বিশ সাল বাদ’। সেটি ছিল অজয় করের ‘জিঘাংসা’র হিন্দি ভার্সান। নায়ক হিসেবে প্রথমে উত্তম কুমারকে ভেবে রাখলেও “শর্মিলা” র ঘটনার পরে উত্তম কুমারের পরিবর্তে নিয়ে এসেছিলেন আরেক বাঙালি নায়ক বিশ্বজিৎ–কে। ‘বিশ সাল বাদ’ এর অভাবনীয় সাফল্য বিশ্বজিৎ–কে বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাঙালি নায়ক হিসেবে। পরে হেমন্ত প্রযোজিত ‘কোহরা’, ‘বিবি আউর মকান’ ছবিতে বিশ্বজিৎ যেমন নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তেমনি আরও অনেক অবাঙালি পরিচালকেরও ডাক পেয়েছিলেন তিনি। যে জায়গাটা উত্তমকুমার অনায়াসেই নিতে পারতেন। অভিনয় দক্ষতায়, গ্ল্যামারে সবেতেই তিনি বিশ্বজিতের থেকে অনেক এগিয়ে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে আরবসাগরের তীরে তাঁর চমকপ্রদ উত্থান হতেই পারত। হল না তাঁর হঠকারী সিদ্ধান্তে। পরে ৬০ এর দশকের শেষের দিকে তিনি নিজের প্রযোজনায় যখন ‘ছোটি সি মুলাকাত’ ছবিতে অভিনয় করলেন, সে ছবি একেবারেই চলল না। তার আগে অবশ্য আরেকবার সুযোগ এসেছিল সুপারস্টার রাজ কাপুরের হাত ধরে। ‘সঙ্গম’ ছবিতে রাজসাহেব চেয়েছিলেন উত্তম কুমারকে । তাঁর ঘনিষ্ঠজনেদের মন্ত্রণাতে উত্তম কুমার রাজি হননি কাজ করতে। কারণ, তাঁকে

বোঝানো হয়েছিল ছবি হিট করলে সবাই রাজ কাপুরকেই কৃতিত্ব দেবে। কারণ মুখ্য নির্মাতা তিনিই। আর ছবি সফল না হলে দায় নিতে হবে উত্তম কুমারকে। কারণ, বলিউডে তিনি একেবারেই নবাগত। সেবারেও নিজেকে হিন্দি ছবিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিয়েছিলেন উত্তম কুমার।

বাংলা ছবিতেও এরকম ছোটখাট ভুল তিনি করেছিলেন বৈকি! মাঝে অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করে তিনি খ্যাতির শীর্ষে তখন। কিন্তু বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায় তারপরে 'চিড়িয়াখানা' ছাড়া আর কোনও ছবিতেই উত্তম কুমারকে দিয়ে কাজ করালেন না। অবশ্য 'নায়ক' পরবর্তী কোনও ছবিতেই উত্তম কুমার মানানসই ছিলেন না। কিন্তু যে তপন সিংহের সঙ্গে উত্তম কুমার 'জতুগৃহ' বা 'ঝিন্দের বন্দী'র মতো ছবিতে অসাধারণ কাজ করেছিলেন, তাঁর 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতেও দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ঋত্বিক ঘটকের মতো প্রবাদপ্রতিম পরিচালককে একেবারেই পাননি উত্তম কুমার। অজয় করকে পেয়েছিলেন পাঁচের দশক থেকে ছয়ের দশকের শুরুতে 'সপ্তপদী' পর্যন্ত। তারপর অজয়বাবুর ভাবনায় শুধুই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অসিত সেনের সঙ্গেও সর্বসাকুল্যে একটিমাত্র ছবি 'জীবনতৃষ্ণা'। আর সাতের দশকের শেষে খ্যাতনামা পরিচালক তরুণ মজুমদারের 'সংসার সীমান্তে' ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন উত্তম কুমার তাঁর গ্ল্যামার নষ্ট হওয়ার কারণ দেখিয়ে। অথচ জীবনের শেষ ৮ বছর অনেক কম বাজেটের ছবিতে কাজ করে গিয়েছিলেন। অখ্যাত অনেক পরিচালকের ছবিতে এমন সব চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যা তাঁকে একেবারেই মানায় না। বিশেষ করে ১৯৭৫–১৯৮০ এই ৫ বছরে উত্তম কুমারের স্মরণীয় অভিনয় বলতে 'অগ্নীশ্বর' এবং 'অমানুষ'। আর শারীরিক কারণেও তিনি তাঁর মধ্যবয়সের রুপলাবণ্য হারিয়েছিলেন। সেজন্যই হয়ত হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন, সেখানেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

যা তিনি পেয়েছিলেন তার থেকে অনেক বেশি উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যেতেই পারতেন। অসম্ভব ভাল ছিলো তাঁর সাঙ্গীতিক বোধ। গানে লিপ দিতেন একেবারে ছবির সেই সিচুয়েশনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে। এই কারণেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, কিশোর কুমার থেকে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ভূপেন হাজারিকা এমনকি হিন্দি ছায়াছবিতে মহম্মদ রফির গান ও তাঁর লিপে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে বরেণ্য পরিচালক দের সঙ্গে সেভাবে কাজ করার সুযোগ পাননি কিছু ভুল সিদ্ধান্তে। একই কারণে বলিউডেও বাঙালির অভিনয় প্রতিভার সাক্ষর রাখতে পারেননি। 'সর্বোত্তম' হওয়ার সুযোগ গুলো নিজেই হারিয়েছিলেন নানা জ্ঞাত–অজ্ঞাত কারণে, যা আজও সিনেমাকুশলী ও তাঁর অগণিত ভক্তদের কাছে রহস্যে ঢাকা।

শুধুই উত্তম? বাকিরা? তাঁদের ভুলে যাবেন?

উত্তম কুমারকে বড় করতে গিয়ে আমরা অহেতুক বাকিদের ছোট করে ফেলি। ভুলে যাই সেই সময়টাকে। প্রত্যেকেই যেন একেকজন দিকপাল। কাকে ছেড়ে কার কথা বলবেন? অথচ, সেই মানুষগুলো উত্তমের আড়ালেই থেকে যান। সেই পরিমণ্ডলে কারা ছিলেন? তুলে আনলেন সরল বিশ্বাস।

বাঙালি না বুঝেই কিছু বিষয়কে ভালবেসে ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাঁকে বড় করতে গিয়ে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।

যেমন ধরা যাক নেতাজি। গড়পড়তা বাঙালি নেতাজি সম্পর্কে কতটুকু পড়েছে, কতটুকু জেনেছে, তা কথা শুনলেই বোঝা যায়। অথচ, কথায় কথায় নেতাজিকে টেনে আনে, আর গান্ধী-নেহরুসহ সবাইকে অহেতুক ছোট করে।

তেমনই এক উদাহরণ দেওয়া যায়। উত্তম কুমার। বাঙালি তাঁকে বড় করতে গিয়ে তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্র জগৎকে অহেতুক ছোট করে বা উপেক্ষা করে। পুরানো মানুষদের অনেককেই বলতে শুনি, উত্তম কুমার নেই, কার সিনেমা দেখব? মনে হয়, উত্তম কুমার একাই যেন চলচ্চিত্র জগৎকে টেনে নিয়ে যেতেন। যেন বাকিদের কোনও ভূমিকাই ছিল না।

উত্তম কুমারকে এতটুকুও ছোট করছি না। কিন্তু তাঁর সমসাময়িকদের একবার দেখুন। উত্তম কুমার কাদের পাশে পেয়েছেন, ভাল করে ভেবে দেখুন। প্রথমেই আসা যাক নায়িকাদের প্রসঙ্গে। সুচিত্রা তো ছিলেনই। বাকিরা কারা? সুপ্রিয়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অঞ্জনা ভৌমিক, অরুন্ধতী দেবী, সুমিত্রা মুখার্জি।

বয়স্ক চরিত্রে কারা ছিলেন? ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, কানন দেবী, সন্ধ্যারানী। সহ অভিনেতা বা সহ নায়কদের কথা ভাবুন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরি, বিশ্বজিৎ, রঞ্জিত মল্লিক, মিঠুন চক্রবর্তী। কমেডিয়ান হিসেবে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, তরুণ কুমার, অনুপ কুমার, রবি ঘোষ।

পরিচালক কারা? দীনেন গুপ্ত, অজয় কর, সত্যজিৎ রায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, তরুণ মজুমদার, তপন সিনহা। গানের জগতের দিকে তাকানো যাক। গান লিখছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন, শ্যামল গুপ্ত, মুকুল দত্তরা। সুর দিচ্ছেন নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখার্জি, সলিল চৌধুরি, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্ত, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্ররা। আক কণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, কিশোর কুমার, ভুপেন হাজারিকা।

তাহলেই ভেবে দেখুন, কাদের পাশে পেয়েছিলেন মহানায়ক। হ্যাঁ, সবাইকে পাশে পেয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে মহানায়ক হয়ে ওঠা সহজ হয়েছে। একেকজন একক দক্ষতায় একটা ছবিকে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন। ভানু একাই কত ছবিকে টেনে নিয়ে গেছেন, একবার ভাবুন। জলসাঘর বা দাদা ঠাকুরের কথা মনে করুন। ছবি বিশ্বাস একাই টেনে নিয়ে গেছেন। গল্প হলেও সত্যি নিশ্চয় দেখেছেন। রবি ঘোষের কথা মনে করুন। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গায় উজ্জ্বল। উত্তম কুমারকে বড় করতে গিয়ে এই সময়টাকে ছোট করবেন না।

কজন ডাক্তার অগ্নীশ্বর দেখেছেন?

যে কোনও ডাক্তারের উচিত, ডাক্তারি পেশায় আসার আগে অগ্নীশ্বর দেখা। মেডিকেল কলেজগুলির উচিত, ছাত্রদের আগে অগ্নীশ্বর দেখানো। মহানায়কের নামে মেট্রো স্টেশন করার থেকে সেটা বেশি জরুরি। এই নিয়ে ভিন্ন স্বাদের একটি লেখা। লিখেছেন সজল মুখার্জি।

আমাদের বেড়ে ওঠা আটের দশকে। তখন টিভিতে জুলাই মাস মানেই উত্তম কুমার। সপ্তাহে একদিন বাংলা ছবি। নিজেদের বাড়িতে টিভিও ছিল না। পাড়ায় এর-ওর বাড়িতে ভিড় করতাম। তখন কোনও বাছবিচারও ছিল না। যা পেতাম, তাই দেখতাম।

সেই তখনই প্রথম দেখা অগ্নীশ্বর। ক্লাস থ্রি-ফোরে যেমন বোঝার কথা, ততটুকুই বুঝেছিলাম। পরে আরও কয়েকবার দেখেছি। শেষবার দেখলাম গত সপ্তাহে। যতবার দেখি, নতুন মনে হয়। একজন ডাক্তারের জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত কী সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে তিনি তথাকথিত নায়ক নন। নায়িকার সঙ্গে তথাকথিত প্রেমের কাহিনিও নেই। কিন্তু একেক বাঁকে অদ্ভুত এক ভাল-লাগা।

একজন চিকিৎসের জীবন কেমন হওয়া উচিত, তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে ছবিটা। কিন্তু এই প্রজন্মের চিকিৎসকরা কি ছবিটা দেখেছেন? দেখলে অন্তত কিছুটা মূল্যবোধ তৈরি হত। তাহলে নার্সিহোমগুলো কসাইখানা হত না। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতাম, সব ডাক্তারের বছরে দুবার করে অগ্নীশ্বর দেখা বাধ্যতামূলক করতাম। ডাক্তারি ক্লাসের প্রথম দিন বলতাম, বাকি শিক্ষা পরে হবে, আগে সবাই অগ্নীশ্বর দেখো। ওটা দেখলেই ডাক্তারির অনেকটা শেখা হয়ে যাবে। এমনকি পরীক্ষার প্রশ্নও আসত অগ্নীশ্বর থেকে।

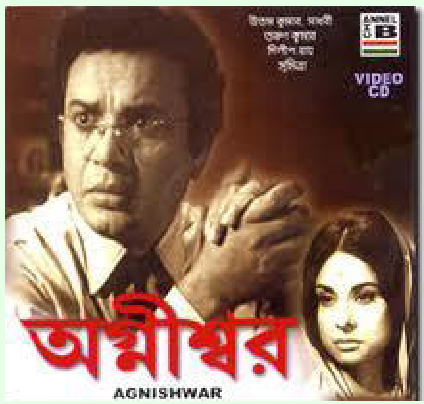

জানি, আমাদের এই যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় এসব কথার কোনও মূল্য নেই। নম্বর ভিত্তিক আর ডোনেশন ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় এর থেকে ভাল আর কী আশা করা যায়? ছাত্রদের কথা ছেড়ে দিলাম। স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী, আমলারা ছবিটা দেখেছেন তো ?

মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ, আপনি নিজে একবার অগ্নীশ্বর দেখুন (হয়ত আগে দেখেছেন, তবু আবার দেখুন)। তারপর আপনার দপ্তরের কর্তাদের দেখতে বলুন। নির্দেশ দিন, ডাক্তারির সব ছাত্রকে যেন অগ্নীশ্বর দেখানো হয়। উত্তম কুমারের নামে একটা মেট্রো স্টেশন করার থেকে এটা অনেক বেশি জরুরি।

অগ্নীশ্বর শেষ করেই বাঘবন্দী খেলা!

অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল উত্তম কুমারের শুটিং দেখার। অবশেষে সুযোগ এসে গেল। তখন শুটিং চলছে অগ্নীশ্বর ছবির। সেই শুটিং শেষ করেই বাঘবন্দী খেলা। একইদিনে এমন বিপরীতধর্মী দুটো চরিত্র! শুটিং দেখার সেই অভিজ্ঞতা মেলে ধরলেন **বিশ্বরঞ্জন দত্ত গুপ্ত**।

অনেক বছর আগের কথা। আমি তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ি। সিনেমা সম্পর্কে এত খুঁটিনাটি না বুঝলেও উত্তম কুমারের অভিনয়ের খুবই ভক্ত ছিলাম। উত্তমকুমার অভিনীত কোনও সিনেমা রিলিজ করলে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে opening day এর opening show দেখতাম। মনে আছে, অনেক কসরত করে বাড়ি থেকে পয়সা জোগাড় করে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কির মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে টিকিট কেটে উত্তম কুমারের সিনেমা দেখতাম। উত্তম কুমার অভিনীত যে সিনেমাই দেখতাম, মনে হত সিনেমার চরিত্রটি একেবারে জীবন্ত হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যেন কথা বলছে। এতটাই সাবলীল লাগত উত্তম কুমারের অভিনয়।

মনে মনে খুব ইচ্ছে হত উত্তমকুমারকে সামনা সামনি কাছ থেকে দেখবার। আমাদের পাড়ার এক দাদার স্টুডিও পাড়ায় কাজের সূত্রে যাতায়াত ছিল। তাঁকে প্রায় রোজই খুব করে অনুরোধ করতাম একবার উত্তম কুমারের শুটিং দেখাবার জন্য। অবশেষে পাড়ার দাদাটির দৌলতে উত্তম কুমারকে একেবারে কাছে থেকে তাঁর শুটিং দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। মনে আছে দুটো বাস change করে এক স্টুডিওতে তাঁর শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম। বড় রাস্তার উপর স্টুডিওতে ঢুকবার বিশাল এক লোহার গেট। গেটটা পার হয়ে ডান দিকে সবুজ ঘাসের ছোট একটা লন। বাঁদিকে কিছু গাড়ি পার্কিং করা রয়েছে। আমার সঙ্গের দাদাটি বলল – তোর ভাগ্য ভাল, উত্তম-

কুমারের গাড়ি পার্কিংয়ে রয়েছে। তার মানে 'দাদা' স্টুডিওতে এসে গেছেন।

একটা ঘরের ভিতরের সেট তৈরি করা হয়েছে। সেটের ভেতর বেশ কয়েকজন লোক তাঁদের নিজেদের কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। জানতে পারলাম এই সেটে একটু পরেই স্বনামধন্য পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জির পরিচালনায় 'অগ্নীশ্বর' ছবির শুটিং হবে। একটু পরে সেটে দেখলাম অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখার্জি আর অন্যান্য অভিনেতাদের। পরিচালক তাঁদের দৃশ্যটা সম্পর্কে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। দু-এক মিনিট পরে দেখলাম সবাই যেন তঠস্থ হয়ে উঠলেন। সুমিত্রা মুখার্জি সহ অন্যান্য অভিনেতারা পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী পজিশন নিলেন। সেটের ভিতর কোলাহলটা নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। সেটে ঢুকলেন ডাঃ অগ্নীশ্বর মুখার্জির বেশে মহানায়ক উত্তম কুমার। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো অপলক দৃষ্টিতে শুধু তাঁকেই দেখে যাচ্ছি। উত্তম কুমারের রূপের আর ব্যক্তিত্বের ছটায় সেট যেন আলোকিত হয়ে রয়েছিল। খুব আস্তে অরবিন্দ মুখার্জির সঙ্গে সামান্য আলোচনা করে উনি শুটিং শুরু করলেন। উপস্থিত সবাইকে বাকরুদ্ধ করে তাঁর অভিনয় শেষ হওয়ার পর উনি সেট থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফিরে আসবার সময় দেখলাম – বাইরে সবুজ ঘাসের লনে অনেক লোক বেষ্টিত হয়ে উনি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। হঠাৎ স্টুডিওর একজন লোক, যতদুর সম্ভব আমার মনে পড়ছে, উত্তম কুমারকে বললেন, 'দাদা, এরপরে আপনার 'বাঘ বন্দী খেলা'র শুটিং রয়েছে। আমরা কি আয়োজন শুরু করব?' উনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। 'অগ্নীশ্বর' আর 'বাঘবন্দী খেলা' ছবি দুটি উত্তমকুমারের অভিনয় গুণে কী অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, সেটা সকলেরই জানা। ডাঃ অগ্নীশ্বর মুখার্জির মতো চরিত্রে অভিনয় করার কিছুক্ষণ পরেই অভিনয় করলেন 'বাঘবন্দী খেলায়'। ভবেশ বাড়ুজ্যের মতো সম্পূর্ণ বিপরীত এক জটিল চরিত্রে। কী করে সম্ভব? পরে বুঝেছি – হ্যাঁ, এটাই সম্ভব, সেইজন্যই তিনি আমাদের কাছে 'মহানায়ক', তিনি আমাদের সকলের প্রিয় উত্তম কুমার।

মহা–কমেডিয়ান

ময়ূখ নস্কর

উত্তমকুমারের অভিনয় জীবনে প্রথম যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল তার নাম সাড়ে চুয়াত্তর। সেটি ছিল কমেডি ফিল্ম। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদারের মতো ডাকসাইটে কমেডিয়ানরা। সত্যি কথা বলতে কি ওই ছবির নায়ক ছিলেন তুলসীবাবু, উত্তমকুমার নন। কিন্তু অভিনয় জীবনের শুরুতেই কমেডির যে বীজ উত্তম কুমারের মনে পোঁতা হয়েছিল তা ডালপালা ছড়িয়েছে তাঁর শেষ ছবি পর্যন্ত।

মহানায়কের জীবনের শেষ ছবি ওগো বধূ সুন্দরীও কমেডি ফিল্ম। সাড়ে চুয়াত্তরে তুলসী চক্রবর্তীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন উত্তম। কিন্তু শেষ ছবিতে সন্তোষ দত্তর মতো অসামান্য কমেডিয়ানকেও মাত করে দিয়েছেন তিনি। হ্যাঁ ওই সিনেমায় উত্তমের কমেডি সন্তোষ দত্তর থেকেও ভাল হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ট্রাজেডি, কমেডি, অ্যাকশন ইত্যাদির মধ্যে কমেডি হল সব থেকে কঠিন। একজন কমেডিয়ান সব সময়েই অসাধারণ অভিনেতা। আর আমাদের মহানায়ক ছিলেন একজন অসাধারণ কমেডিয়ান। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বেশ কিছু সিনেমায়।

সেটা ছিল বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ। বাংলা কমেডিরও। ভানু, জহর, তুলসী, সন্তোষ, নবদ্বীপ, নৃপতি, রবি, চিন্ময় কাকে ছেড়ে কার কথা বলি। কিন্তু এঁদের মধ্যেও সমান উজ্জ্বল উত্তম। ভাবুন ধন্যি মেয়ের কথা। রবি ঘোষ, চিন্ময়, জহর আছেন সিনেমাতে। অন্য কোনও নায়ক হলে এঁদের সঙ্গে এক পর্দায় কমেডি করার চেষ্টাই করতেন না। রোম্যান্টিক নায়কোচিত অভিনয় করতেন। কিন্তু উত্তম কমেডিই করলেন। এবং ফাটিয়ে দিলেন। একই সিনেমায়, সাবিত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য খুনসুটি, পার্থর স্নেহশীল দাদা, আবার কমেডিয়ান! জিও! গুরু জিও!

ভাবুন ভ্রান্তিবিলাস সিনেমার কথা। উত্তমের ডাবল রোল। ভানুরও ডাবল রোল। কমিক সেন্স না থাকলে ডাবল ভানুর কাছে যে কেউ ভ্যানিশ হয়ে যেত মশাই ভ্যানিশ হয়ে যেত। ভাবুন ছদ্মবেশীর কথা, ভাবুন ব্রজবুলির কথা। ভাবুন অবাক পৃথিবীর কথা।

নায়ক না হয়ে শুধু কমেডি করলেও উত্তম মহান থেকে যেতেন। হতেন মহা- কমেডিয়ান।

মহা-খলনায়ক

দিব্যেন্দু দে

উত্তম কুমার তাঁর জীবনের সেরা অভিনয় করেছিলেন কোন সিনেমায়? না সপ্তপদীর মতো রোম্যান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘবন্দি খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন ভিলেন।

যদি এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত না হোন, তাহলে মন দিয়ে সিনেমাটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পণ নাটকে নীলকর সাহেবের ভুমিকায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির অভিনয় দেখে বিদ্যাসাগর জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এতটাই বাস্তবোচিত হয়েছিল সেই অভিনয়।

বাঘবন্দি খেলাতে উত্তমের অভিনয় দেখেও তেমনই ঘৃণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্তম দুই ধরনের ভিলেনি দেখিয়েছেন। প্রথম পর্বে নিজের স্ত্রী বাচ্চাদের ছেড়ে বেশ্যা নিয়ে মেতে থাকেন। বাজার থেকে আনা মাছ একা একাই খান। ছেলেমেয়েদেরও ভাগ দেন না। আবার দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভদ্রলোকের মুখোশ পরে থাকা শয়তান। বাইরে সমাজসেবী রাজনীতিবিদ। ভিতরে ভিতরে নারীপাচারকারী। উৎপল দত্তর কথা মাথায় রেখেই বলছি, বাংলা সিনেমায় এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভিলেন চরিত্র। আসলে মহানায়ক হতে গেলে শুধু রোম্যান্টিক নায়ক হলে হয় না, অলরাউণ্ডার হতে হয়। আর উত্তম ছিলেন তাই। তাই নায়কের পাশাপাশি খলনায়কের ভুমিকাতেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। আলো আমার আলো এবং সন্ন্যাসী রাজার একটা পর্যায় পর্যন্ত উত্তমের চরিত্র কিন্তু নেগেটিভই ছিল। স্ত্রী সিনেমাতে ঠিক ভিলেন না হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু একজন খুনি।

ঠিক যেমন লাল পাথরে তিনি একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি। পূর্ণিমা রাতে ফতেপুর সিক্রিতে স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিককে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে খুনের ছক কষেন। একটি অংশে তাঁর স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রেমিক আগ্রা দুর্গ থেকে তাজমহল দেখছেন, আর পিছনে ওঁত পেতে আছেন খুনি উত্তম। ওফ! অসাধারণ। কে বলবে ইনি সেই হারানো সুরের নায়ক।

সব ট্রফিই তো ইস্টবেঙ্গলকে দিচ্ছো!

উত্তম কুমারকে নিয়ে তাঁর অনেক স্মৃতি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আড্ডায় মাঝে মাঝেই বলতে শোনা যেত। সেই পি কে ব্যানার্জি আর নেই। কত অজানা গল্প হারিয়ে গেল। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে, আড্ডায় ট্রেনের এক সকালের স্মৃতি মেলে ধরেছিলেন পি কে ব্যানার্জি।

সেবার ডুরান্ড খেলে দিল্লি থেকে ফিরছি। তখন আমিও রেলের বড় অফিসার। হঠাৎ চেকার এসে আমাকে বললেন, এই ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে উত্তম কুমারও ফিরছেন। শুনে ওই চেকারের হাত দিয়ে একটা চিরকুট লিখে পাঠালাম। তার আগে বলে রাখি, উত্তম কুমারকে আমি বড়দা বলে ডাকতাম। লিখেছিলাম, বাংলার বরেণ্য অভিনেতা, আপনার সঙ্গে একটু আড্ডা হবে কি ?

জবাবে উত্তম পাঠালেন, 'বাংলার বরেণ্য পিকে। আমিও আড্ডা মারতে চাই। কিন্তু আজ হবে না। তুমি কাল সকালে আমার সঙ্গে ব্রেক-ফাস্ট করো।' মনে আছে, এই লেখাটা আমার মেয়ে পলা স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে নাকি মহানায়কের হাতের লেখা দেখতে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল।

যাক, যা বলছিলাম, পরের দিন সকালেই ডাক পড়ল আমার। ফার্স্ট ক্লাসের কুপে ঢুকে দেখি সুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে প্রাতরাশ সাজিয়ে বসে আছেন আমাদের মহানায়ক। আমাকে দেখেই বললেন, আরে, সব ট্রফিই তো ইস্টবেঙ্গলকে দিচ্ছো। আমাদের জন্য কিছু করো।' প্রসঙ্গত সে বছরই মোহন বাগানের দায়িত্ব নিয়েছি আমি।

তারপর কত গল্প। খালি বলছেন, কি পিকে, ট্রফি আসবে তো ? হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা, আমার কাফ মাশলটা টিপে দেখ তো, আমি ফুটবলার হতে পারতাম কিনা।' আমি তো লজ্জায় মরি। মহানায়কের গায়ে হাত দেব! সুপ্রিয়া দেবী দেখি হাসছেন। টিপে সেই দেখতেই হল। বললাম, 'ভাগ্যিস, ফুটবলটা খেলেননি। তাহলে আমাদের মুশকিল হয়ে যেত।' হো হো করে হেঁসে উঠলেন। সেই ভুবন ভোলানো হাঁসিতে বললেন, মন রাখার জন্য খুব তেল দিচ্ছো, তাই না ?

পাক্কা মোহনবাগানি ছিলেন। সব খবর রাখতেন। তবে মাঠে খুব একটা আসতেন না। বলতেন, 'আমি গেলে খেলার বারোটা বেজে যাবে।' রোভার্সে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিজের বাড়িতে একবার জমকালো পার্টিও দিয়েছিলেন।

এমন কত স্মৃতি। বলতে গেলে ফুরোবার নয়। অভিনয়ের জন্য তো অনেকেই চেনেন। কিন্তু কতখানি ফুটবলপ্রেমী, তা যেন আড়ালেই থেকে গেল।

একটি রাত এবং একা উত্তম কুমার

অম্লান রায়চৌধুরী

একা একা থাকাটা বা থাকার ইচ্ছাটা প্রায় সব সেলিব্রেটিরই স্বপ্ন। কারণ, তাঁদের একা থাকার সুযোগটা বড়ই কম। শুনেছি ভারতের নামী শিল্পপতিরা নাকি বিদেশে গিয়ে একা রাস্তায় হাঁটেন, পার্কে যান, গিয়ে বসেন নিজের ইছা মতন কিছু কিনে খান - যেখানে কেউ তাঁদের চেনে না, কোনও ভীড় হয় না। এটা তাঁদের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি।

উত্তম কুমারের মতো একজন অত বড় মাপের সেলিব্রেটি – জনপ্রিয়তার শেষ কথা, তাঁরও একটু একা থাকার স্বাদ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সেই ভাবনা থেকেই তাঁকে স্মরণ রেখে এই নিবন্ধ।

একা থাকার শুরুটা সেই টালিগঞ্জের ওই উঁচু জায়গাটা। যেটাকে ছেড়ে নেমে এলেন নীচে রাস্তায়। নিশুত রাত। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, এত রাতেও কেউ কোথাও আছে কি না। এমনিতেই ঘন বর্ষার মরশুম। লোকজনের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। চারিদিক শুনশান দেখে বেশ হালকা লাগল তাঁর। কতদিন যে খোলা হাওয়ায় হাঁটেননি তিনি। লোকের ভিড়, আলোর দুনিয়া অহোরাত্র তাঁকে ঘিরে রেখেছে।

কেউ বুঝতেও পারেনি, এই আলোর সংসারও তাঁকে শেষমেশ কিছু যন্ত্রণাও দিয়েছে। তাঁর মনে পড়ছে, একদিন জগুবাবুর বাজার থেকে একটা গোলাপ ফুল কিনতে চেয়েছিলেন তিনি। স্বয়ং তিনিও গোলাপটি চেয়ে পাননি। কেননা, নিজে না নেমে ড্রাইভারকে নামিয়েছিলেন। ড্রাইভার সঠিক ফুলটি আনতে পারেননি। একা কেনার স্বাদটা মিটল না। আর তিনি নিজে নামলে? সে এক কাণ্ডই হত বটে।

আবার মনে পড়ল, বেশ কিছু দিন আগের কথা, এক আত্মীয়ের বিয়েতে অত রাতেও গিয়ে সে কী ভিড়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এই যে ঘেরাটোপের মধ্যে সারাক্ষণ থাকা, এ কি তাঁকে কষ্ট দেয়নি? দিয়েছে। কিন্তু বুঝেছে ক'জন? আর এসব না থাকলেও যে নয়।

একবার বম্বের এক পরিচালক জানতে চেয়েছিলেন, কেন তাঁর পারিশ্রমিক এত বেশি। সোজা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন মেয়েদের একটি স্কুলের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে সবে সিগারেট ধরিয়েছেন, অমনি হু হু করে ভিড়। আর কিছু বলতে হয়নি। পরিচালকের যা বোঝার বুঝে গিয়েছিলেন।

সেবার বন্যার সময় মায়েরা-বোনেরা যে গায়ের গহনা খুলে দিয়েছিলেন সে তো তাঁকে দেখেই। তিনি তো তাই সবাইকেই বলতেন, নায়কদের এত প্রকাশ্যে আসতে নেই। একবার শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছিলেন পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে তেল ভরাচ্ছেন গাড়িতে। শুভেন্দুকে পরে বলেছিলেন, আরে ছায়াছবির লোক যদি নাগালেই থাকবে, তাহলে আর নায়কোচিত ইমেজটির কী হবে? নিজে সেদিন বারণ করেছিলেন।

আসলে নায়ক হওয়া, জনপ্রিয়তার অমৃত পান, একরকম নীলকণ্ঠ হওয়া। এই ইমেজটা উনি বয়ে নিয়ে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। জানি না আজকের এই মিডিয়া অধ্যুষিত সমাজে ওটাকে উনি কীভাবে রাখতেন।

আজ অনেকদিন পর ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে পেরে ভালেই লাগছে। ফুরফুরে লাগছে। গুণগুন করে একটা গান গাইতে ইচ্ছে করছে। তাঁরই ছবির ······ এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হত? কে জানে কেমন হত, পেছনে ফিরে একবার নিজের মুর্তিটিকে দেখলেন।

ভাবতে ভাবতে চলেছেন, কত দাপুটে অভিনেতাকেই তিনি দেখেছেন। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল। বাপরে বাপ, কী স্ক্রিন প্রেজেন্স তাঁদের। তারপর তাঁর তুলসীদা, মানে তুলসী চক্রবর্তী। উফফ কী স্বাভাবিক অভিনয়টাই না করতে পারতেন। বিকাশ রায়! কি কণ্ঠস্বরের ওঠা পড়া আর সেই শরীরি অভিব্যাক্তি – পর্দা মাত করে দিতেন। আরও কত তুখোড় অভিনেতা বাংলায় ছিলেন, আছেন, থাকবেন। কিন্তু সকলেই তিনি নন। উনি নিজেই অবাক যে কী করে যেন তিনি একটু একটু করে মহানায়ক হয়ে গেলেন।

উনি ভাবছেন, যখন অভিনয় জীবন শুরু করেছেন, সেটা ছিল বাংলা সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে একটা সন্ধিকাল। দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসন শেষ। সবে স্বাধীন হয়েছে ভারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে ভেঙেচুরে যাচ্ছে পুরনো মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক জীবনেও নেমে আসছে একটা বড় পরিবর্তন। মধ্যবিত্ত বাঙালির যৌবনের চিন্তাধারা, সমাজচেতনা তখন পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে এক নতুন আশার ভিত্তিভূমি। এই সব কিছুর সঙ্গেই, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গেই বদলে যাচ্ছে প্রেমের ধরণটাও। আর সেই পরিবর্তমান প্রেমের ধারণা খুঁজে বেড়াচ্ছিল এক নতুন ‘রোম্যান্টিক আইডল’কে। বাঙালি যৌবনের সেই ‘রোম্যান্টিক আইডল’ খুঁজে বেড়ানোটা যেন খানিকটা দিশা পেল তাঁকে পেয়ে। তবেই না উনি আজও বাঙালির স্মৃতিবিলাসের ‘ম্যাটিনি আইডল’, পূজার ছলে আমরা যাঁকে ভুলেই থাকি।

এটাও সত্যি যে, তাঁর কোনও বিরাট ক্ষমতা ছিল না, ছিল না কোনও সংস্থার সমর্থন, যেমন ছিল না তাঁর চরিত্রদেরও। সাধারণ থেকেও অসাধারণ হয়ে ওঠার

যে ক্ষমতা ছিল তাঁর চরিত্রদের, তাই বোধহয় ছিল একটা গোটা জাতির প্রত্যাশা।
তিনি এখন বুঝতে পারছেন যে তিনিই ছিলেন সেই সব চাহিদার প্রতিনিধি। আর সামাজিক চৌহদ্দির ভিতর বাস্তবতা যা পূরণে অপারগ ছিল, তিনি তা বিকল্প বাস্তবতায় সম্ভব করে তুলতে পারতেন।

এ তো ইতিহাসের নায়করা করতে পারেন না। এর জন্য খোঁজ পড়ে ইতিহাসের প্রসারিত সীমায় ইতিহাস তৈরি করা এক মানুষের। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তাঁর এই চিরকালীন জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ তাঁর বাঙালিয়ানার প্রতীক। বাঙালিয়ানার প্রতীক বলতে তাঁর সুদর্শন চেহারা বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা নজরকাড়া ব্যক্তিত্বই শুধু নয়। তিনি ছিলেন বাঙালি সত্তার এক সম্পূর্ণ 'প্যাকেজ' । তাঁর সমকালীন সময়ে তৈরি হওয়া বাংলা ছবিতে তিনি দারুণভাবে মিশ খেয়ে যেতেন তাঁর ব্যক্তিত্ব, হাসি, সম্পূর্ণ ভাবমূর্তিই।

সাবেকি বাঙালি দর্শকের কাছে ছবিতে বৈষয়িক আতিশয্যের আবেদন ছিল না সেভাবে। বরং তাঁদের বেশি ভাল লাগত সহজ জীবন দর্শন এবং যাপন; মেধার কদর; সরল রোম্যান্টিকতা; শ্রুতিমধুর গান এবং দৃষ্টিমধুর অভিব্যক্তি। এই সমস্ত জোগান তখনকার দিনের পরিচালকরা দিলেও তা পর্দায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি দুর্দান্ত মাধ্যমের আর সেই কাজটিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত ।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎই মনে এল তাঁরই প্রিয় নায়ক মারচেল্লো মাস্ত্রোইয়ান্নির কথা। যাঁকে উনি অনেকাংশেই অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। শুনেছি স্ক্রিপ্টের খাতিরে একবার মারচেল্লো মাস্ত্রোইয়ান্নিকে বলতে হয়েছিল 'আমি ইউরোপের সব থেকে রূপবান পুরুষদের একজন' (অ্যান এত্তারো দি চিয়েলো, ১৯৫৯) – শুধু মাত্র কথার কথা হিসাবে কথাটা ঢোকানো হয়নি, বুঝতেই পারছেন, কথাটার যৌক্তিকতাটা কতটা। শুধু মাত্র সমাপতন হিসাবে দেখলে চলবে না।

সে যুগে যা হত আর কী, লোকজন সেক্স অ্যাপিল ট্যাপিলের কথা শুনেছে, ব্রিজেট বারদো কি সুপ্রিয়াকে নিয়ে সেসব ভাবলেও নায়কদের জন্য থাকত একটা সম্ভ্রম মেশানো তারিফ! কী রূপ দেখেছ? পুরুষ–মহিলা নির্বিশেষে এই দেহজ সৌন্দর্যকে খানিকটা প্লেটোনিক অ্যাঙ্গল থেকেই দেখে এসেছেন এটা ঠিকই। কিন্তু এই সৌন্দর্যকে কখনও কি ভয়ঙ্কর টেক্সটবুক পুরুষালী বলে মনে হয়েছে। আদপেই নয়, নায়কদের–ও যে একটা প্রশংসনীয় কমনীয়তা থাকতে পারে, সেটা বোঝানোর জন্য বোধহয় সব সেরা উদাহরণ উত্তম এবং মারচেল্লো। হয়ত সেজন্যই রোম্যান্টিক নায়ক হিসাবেও দুজনে অত্যন্ত সফল।

মারচেল্লো মাস্ত্রোইয়ান্নি র 'লা দোলচে ভিটা' কিংবা 'ডিভোর্স, ইটালিয়ান স্টাইল' দেখার পর অনেকেই

কেমন যেন তাঁর গন্ধ পেয়েছিলেন সারা ছবিতেই। বিস্তর আলোচনাও হয়েছিল। তুলনামুলক ভাবে ভাবতে গেলে সাবকনসাস মাইন্ডে একটা ধাক্কা নিশ্চয়ই এসেছে। ওই ছবির সেই সিকোয়েন্স – সিসিলির দুপুরে ঘামে ভেজা ব্যরনের আবির্ভাব পর্দায়। ওটা সিসিলির হিউমিড দুপুর না হয়ে ধর্মতলার প্যাচপেচে বিকালই হোক, পড়তি ব্যারনের জায়গায় না হয় বিশ্বম্ভর রায়ের মতন ঝড়ে পড়া বনেদিই হোক, ফার্স্ট কাজিনের সঙ্গে বিবাহোত্তর অবৈধ প্রেম যদি বাঙালি সংস্কৃতিতে একটু বেশি গুরু মনে হয়, অন্য কিছু ভাবেই না হয় প্রেমটা হোক - তবে 'বিবাহোত্তর' ব্যাপারটাকে রাখতেই হবে, তা হলে তাঁকে কেমন লাগত – সেটা নিয়েও আমাদের সঙ্গে তাঁরও ভাবনা ছিল। এ গুলো নিয়ে গভীর ভাবে ভাবা যেতেই পারে। উনি নিজেও ভাবছেন ওই একলা চলার মাঝে।

তিনি বেশ মনে করতে পারছেন, তাঁর মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সিগ্নেচার ছিল যেটা তাঁরই তৈরি ছিল পুরোদস্তুর। অবশ্য এটা উনিও মানছেন যে, সেই সময় উনি একাই এই গুণের অধিকারী ছিলেন, তা নয়। চারিদিকে নানান নামী নামের ছড়াছড়ি। কিন্তু তাঁর ভদ্র নম্র আবেদন দর্শকদের কাছে ছিল বিশেষ প্রিয়। খলনায়ককে পিটুনি দিয়ে নিজের নায়কোচিত পৌরুষ বনা বা আজকের দিনের 'ম্যাচো' র ভাব আনতে হয়নি তাঁকে। সেসব না করেও সহজভাবে তিনি ঢুকে গিয়েছেন তাঁর চরিত্রের অন্তরে। এর কারণ, তিনি অভিনয়ের সূক্ষ দিকগুলিকে ওস্তাদের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। আর সেই ওস্তাদি শুধুমাত্র প্রতিভা থাকলেই রপ্ত হয় না; তার জন্যে প্রয়োজন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা, যা তাঁর ছিল।

আজকের তুলনায় তিনি ছিলেন মান্ধাতার আমলের মানুষ; কিন্তু হারিয়ে যাননি। তিনি বাজার অর্থনীতির প্রযুক্তি নির্ভর কলাকুশলীদের পূর্ববর্তী সময়কার শিল্পী হয়েও আজকের বাজারে জনপ্রিয়তার দৌড়ে হার মানেননি। মানুষ হিসাবে ছিলেন বড় মাপের। সহকর্মীদের আর্থিক বিপদের দিনে পাশে দাঁড়াতেন নিঃস্বার্থভাবে। কাউকে জানতেও দিতেন না।

তাঁর হাঁটা শেষ। এসে থামলেন সেই স্টুডিও পাড়ার কাছে টালিগঞ্জের মোড়ে। ফিরে গেলেন আবার সেই বন্দিদশায় – যেখান থেকে তিনি দেখছেন আজকের শিল্পকলা যেখানে মধ্য, নিম্ন মেধার বাড় বাড়ন্ত – শিল্পের মূল্যায়ন হয় ব্যবসায়িক নিরিখে, অধিকাংশ শিল্পই তাদের শৈল্পিক মূল্য হারিয়ে ফেলেছে কেবলই বিনোদনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে। দর্শক তৈরি হয়নি, করতে পারেনি আজকের শিল্প কুশলীরা। এসেছে চটক ও সাময়িক ক্ষিধের নিবৃত্তি। তাঁর বিষন্নতা এলেও তিনি তো চুপ হয়ে গেছেন সেই কবে থেকেই ।

তবে শেষে একটা কথা না বলে শেষ করা ঠিক হবে না। উত্তম কুমারকে নিয়ে আমরা নস্টালজিয়ায় ভুগলেও তাঁর লিগ্যাসি বাঁচিয়ে রাখার মতো কাজ কটা করতে পেরেছি? তাঁর অভিনীত প্রত্যেকটি ছবিকেই আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি কি? তাঁর নামে একটি মিউজিয়াম বা গবেষণা কেন্দ্রের নাম আজ দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই পারত।

সংরক্ষণের সংস্কৃতি আমরা যদি আজও না শিখি তবে আর কবে শিখব?

বলিউডকেও কিন্তু পথ দেখিয়েছিলেন মহানায়ক

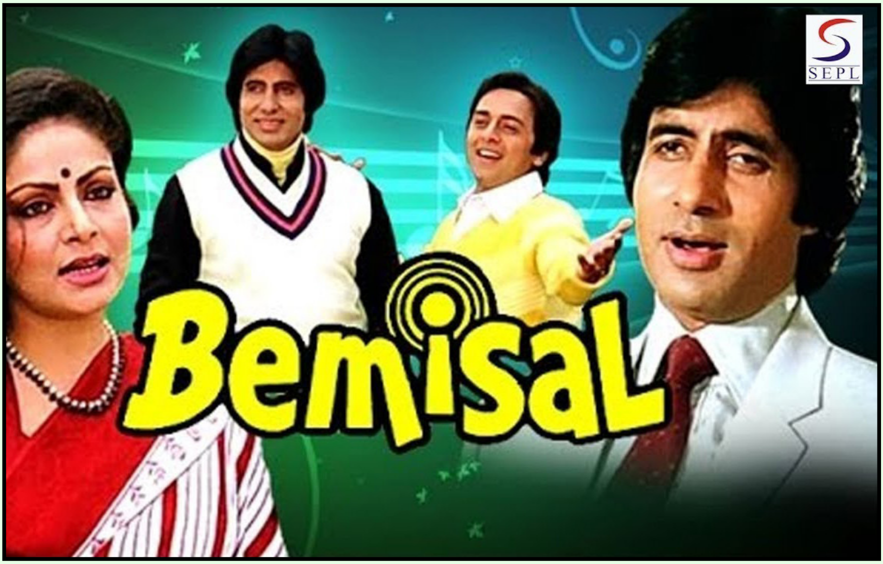

হিন্দি ছবির দুনিয়ায় খুব একটা সফল হতে পারেননি। আসমুদ্র হিমাচল হয়ত তাঁকে সেভাবে চিনল না। বাঙালির মহানায়ক হয়েই থেকে গেলেন। কিন্তু যাঁরা চেনার, চিনতেন। অনুসরণ করতেন। তাই তাঁর অভিনীত বাংলা ছবিই কয়েক বছর পর হিন্দিতে হয়েছে। তাতে অভিনয় করেছেন দিকপাল অভিনেতারা। লিখেছেন বৃষ্টি চৌধুরি।

সেই কতকাল আগে মহামতী গোখলে বলে গিয়েছিলেন, বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেকে সিনেমা, খেলা থেকে গানবাজনা, সব ব্যাপারেই বাঙালি যেন অগ্রণী ভূমিকা নিত। তাকেই অনুসরণ করত গোটা দেশ।

সেই ব্যাপারে পথ দেখিয়ে গেছেন মহানায়ক। তিনি নিজে হয়ত হিন্দি ছবিরু দুনিয়ায় খুব একটা সফল হতে পারেননি। আসমুদ্র হিমাচল হয়ত তাঁকে সেভাবে চিনল না।

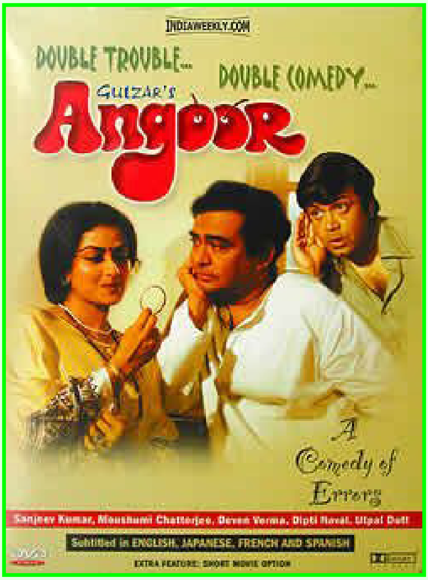

বাঙালির মহানায়ক হয়েই থেকে গেলেন। কিন্তু যাঁরা চেনার, চিনতেন। অনুসরণ করতেন। তাই তাঁর অভিনীত বাংলা ছবিই কয়েক বছর পর হিন্দিতে হয়েছে। তাতে অভিনয় করেছেন দিকপাল অভিনেতারা।

এখানে কয়েকটি নুমনা তুলে ধরা যাক। পাঁচের দশক ও ছয়ের দশকে উত্তম কুমারের বেশ কিছু ছবি হিন্দিতে হয় একই নামে, অথবা অন্য নামে মুক্তি পায়। যেমন উত্তম--সুচিত্রা অভিনীত 'সবার উপরে' ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।

১৯৫৫ সালে উত্তম কুমারের আরেকটি ছবি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিমল মিত্রর লেখা 'সাহেব বিবি গোলাম'। সাত বছর পর হিন্দিতেও সেই ছবি তৈরি হল। নায়ক গুরু দত্ত। ১৯৫৫ তেই আরও একটি ছবি খুব হিট করেছিল। উত্তম-সুচিত্রার অগ্নি পরীক্ষা।

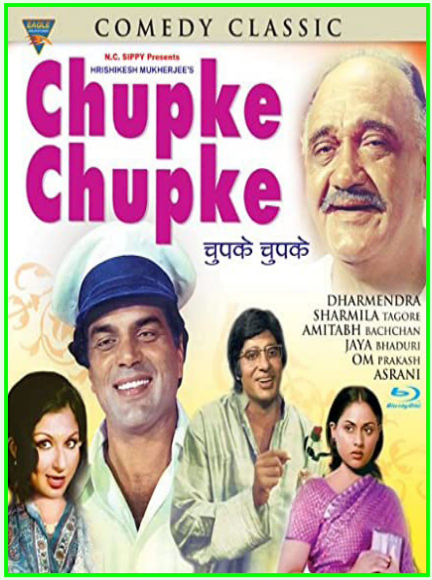

বারো বছর পর সেই ছবি এল বলিউডে। সেটা অবশ্য উত্তম কুমার নিজেই করেছিলেন। সঙ্গী বৈজয়ন্তীমালা। ছবির নাম? ছোটি সি মুলাকাত।

১৯৬৭ তে উত্তম-সুপ্রিয়ার জীবন মৃত্যু ছবির কথা মনে পড়ছে? অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয়েছিল এক ব্যাঙ্ক কর্মীকে। সেই অভিযোগে জেল খাটেন। পরে সর্দারজির ছদ্মবেশে ফিরে আসেন, সেই ষড়যন্ত্রীদের সায়েস্তা করেন। হ্যাঁ, সেই কাহিনী নিয়ে হিন্দিতেও ছবি হয়েছিল। উত্তম কুমারের পরিবর্তে ছিলেন ধর্মেন্দ্র। এক্ষেত্রে ছবির নাম বদল হয়নি। জীবন মৃত্যুই রাখা হয়েছিল।

বাংলায় লাল পাথর ছবিটা তেমন চলেনি। টিভিতেও খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু ১৯৬৩ তে তৈরি সেই ছবিকে নিয়ে পরে হিন্দি ছবি হয়েছিল। ছবির নাম লাল পাথর। এক্ষেত্রে উত্তমের জায়গায় ছিলেন রাজ কুমার।

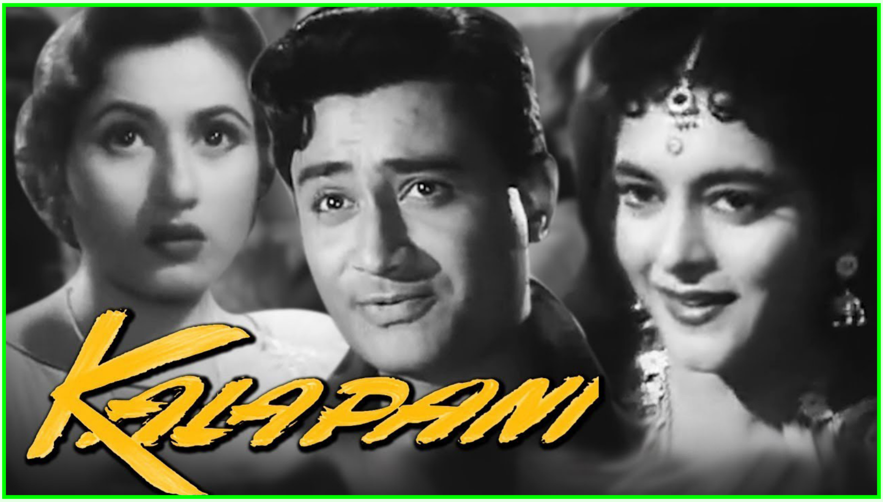

উত্তম আর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাবল রোল। ঠিক ধরেছেন। ভ্রান্তি বিলাস। সেক্সপিয়ারের কাহিনি নিয়ে বাংলায় তৈরি ছবি বেশ সাড়া ফেলেছিল। এখনও মাঝে মাঝেই টিভিতে দেখা যায় ছবিটি। এই কাহিনী নিয়েই ছবি করেছিলেন গুলজার। বারবার উত্তম-সাবিত্রী-ভানুর ওই ছবি দেখেছেন। নিজেও একাধিক সাক্ষাৎকারে সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। হিন্দিতে তৈরি হল আঙ্গুর। উত্তমের জায়গায় সঞ্জীব কুমার। আর ভানুর বদলে দেবেন বর্মা।

আরও একটি হাসির ছবি। ছদ্মবেশী। বেরিয়েছিল ১৯৭১ সালে। চার বছর পর সেই ছবি হল হিন্দিতে চুপকে চুপকে। পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি। উত্তমের ভূমিকায় ধর্মেন্দ্র, আর শুভেন্দুর ভূমিকায় অমিতাভ

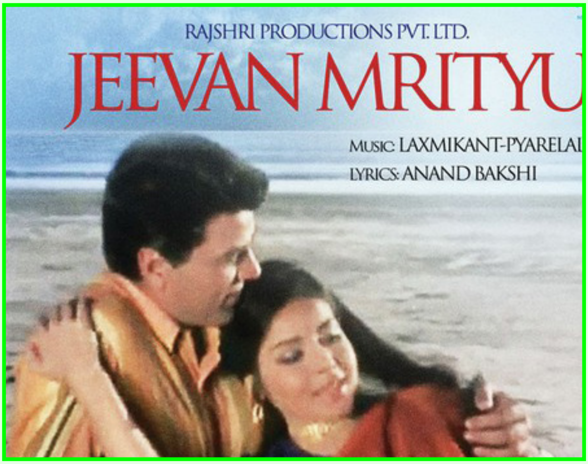

বচ্চন। অমিতাভ ও ধর্মেন্দ্র দুজনেই বেশ কয়েকবার ছবিটি দেখেন। ধর্মেন্দ্র এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, উত্তম কুমারের চরিত্রটি দেখার পর তাঁর কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। চরিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং তিনি একথাও অকপটে স্বীকার করেন, উত্তম কুমার ওই চরিত্রটিকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে সেই উচ্চতায় পৌঁছনো সম্ভব হয়নি।

সাতের দশকে আরেক ত্রিকোণ প্রেমের ছবি। আমি সে ও সখা। হিন্দি ছবির নাম বেমিসাল। এক্ষেত্রে উত্তমের জায়গায় অমিতাভ। আরও দুটি জনপ্রিয় ছবি। দুটির পরিচালকই বাঙালি। দুটিই একই নাম নিয়ে হিন্দিতে হয়েছিল। দুটিতেই নায়ক সেই উত্তম কুমার। ঠিক ধরেছেন, অমানুষ ও আনন্দ আশ্রম। দুটি ছবিরই পরিচালক শক্তি সামন্ত। আগে বাংলায়, পরে হিন্দিতে হয়েছিল।

সাতের দশকের আরেক সুপারস্টার রাজেশ খান্না! তিনিও উত্তমের জুতোয় পা গলিয়েছেন। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৈরি ছবি নিশিপদ্ম। কয়েক বছর পর এটাও হিন্দিতে হয়েছিল। নাম অমর প্রেম। অভিনয়ে ? রাজেশ খান্না।

এইসব ছবিতে প্রত্যক্ষভাবেই থেকে গেছেন উত্তম কুমার। আরও অনেক ছবি আছে, যেখানে সরাসরি হয়ত নেই। তবে সেই ছায়াটা থেকে গেছে। এখনও বলিউডে বেশ কিছু ছবি তৈরি হচ্ছে, যার সঙ্গে ছয়ের দশক বা সাতের দশকে তৈরি বাংলা ছবির নানা মিল থেকে গেছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বলিউডের উপর মহানায়কের প্রভাব কতটা। তিনি নিজে হিন্দিতে কী কী ছবি করেছেন, কতটা সফল হয়েছেন, এটাই তাঁর একমাত্র মানদণ্ড নয়। তার বাইরেও বলিউডে একটা প্রভাব থেকে গেছে। যা খুঁজতে হয় দেবানন্দ, অমিতাভ, ধর্মেন্দ্রদের চরিত্রগুলির মধ্যে।

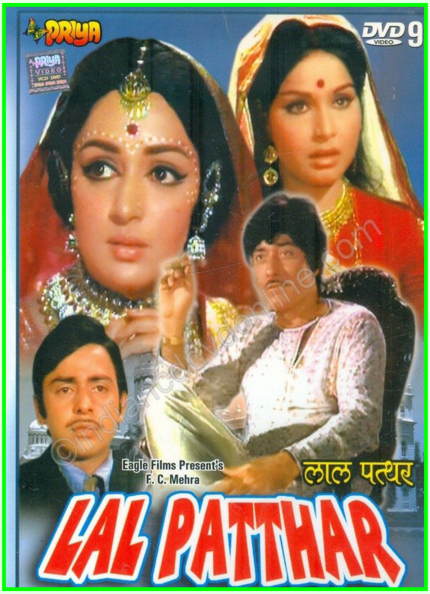

অন্য এক যুগলবন্দি

উত্তম আর হেমন্ত যেন এক যুগলবন্দি। কিন্তু এমন অনেক গান আছে, যে ছবিতে উত্তম আছেন, কিন্তু হেমন্তর গান অন্য কারও লিপে। কোথাও উত্তম শ্রোতা। আবার কোথাও গান বাজছে নেপথ্যে। এমনই এক অন্যরকম যুগলবন্দির কাহিনি তুলে ধরলেন পৃথা কুণ্ডু।

পূর্বস্মৃতি হারানো স্বামীর বাড়িতে এসেছেন এক নারী। নিজের মর্যাদা, অবস্থান, অহং বিসর্জন দিয়ে গভর্নেসের কাজ নিয়েছেন – স্বামীর কাছাকাছি থাকবেন বলে। অথচ স্বামী তাঁকে চিনতে পারেন না, তাঁর নিরুচ্চার ভালবাসায় ভরা উদ্বেগকে দূরে ঠেলে দেন – 'কৌতূহল থাকা ভাল, কিন্তু কৌতূহলের একটা সীমারেখা থাকা দরকার।' ভদ্রলোক অবশ্য বোঝেন, চাকরি করতে আসা এই মহিলা বিবাহিতা। তাই পরে যখন তিনি জানতে চান ভদ্রমহিলার স্বামীর কথা, উত্তর আসে, 'আমার স্বামী আমাকে ভুলে গেছেন!' এ উত্তর যেন একটু ভাবিয়ে তোলে ভদ্রলোককে। একলা ঘরে তাঁর ভাবনার সঙ্গী হয় রেডিও থেকে ভেসে আসা একটি গান – 'আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে।'

সাদাকালো পর্দার মায়ায় আর সেই মায়াবী কণ্ঠের আবেশে একসময় মজেছিল আম-বাঙালি, আজও সে আবেশ একেবারে হারিয়ে যায়নি। কিন্তু 'হারানো সুর' ছবির এই গানটির জনপ্রিয়তার আবেগে কেবল না ভেসে আমরা কি ভেবেছি, কতটা ব্যতিক্রমী ছিল এই গানের প্রয়োগ? গানটি পুরুষকণ্ঠে। ঘরের মধ্যে বসে শুনছেন আর এক পুরুষ, যাঁর ঠোঁটে এর আগে ওই কণ্ঠেরই গান প্রভূত সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু এখানে গানটি তাঁর নয় – 'এই শপথের মালা খুলে/আমারে গেছ যে ভুলে/তোমারেই শুধু দেখি বারে বারে আজ শুধু দূরে থেকে।' আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের কথা তো তাঁদেরই মানায়, সব জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করেও যাঁদের কল্যাণী মূর্তিতে আড়ালে থাকতে হয় 'নিজেরে লুকায়ে রেখে'। অন্যভাবে বলতে গেলে –গানটি যেন উত্তমের উদ্দেশে হেমন্ত গাইছেন সুচিত্রার হয়ে! শোনা যায়, ছবিতে এই গানটি রাখার জন্য গায়ক- -সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হয়েছিল পরিচালক এবং নায়ক-প্রযোজকের যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও। আমরা সবাই জানি – কতখানি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল এই গানটি ছবির সাফল্যের ক্ষেত্রে।

এ এক ভিন্নধারার ‘যুগলবন্দি’র আখ্যান – উত্তমের সাথেই আছেন হেমন্ত, কিন্তু তাঁর ঠোঁটে গান গাইছেন না। এমন উদাহরণ কিন্তু কম নয় এই জুটির সহাবস্থানের ইতিহাসে। ‘বউঠাকুরানীর হাট’ (১৯৫৩) ছবিতে দেখা যায়, বন্দি রাজপুত্রের চরিত্রে উত্তম ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে হেমন্তর গান শুনে কাঁদছেন। এটি তাঁর প্রথম দিককার ছবি। খেয়াল করলে বোঝা যাবে, অন্যান্য দৃশ্যের তুলনায় এই চোখের জল ফেলার দৃশ্যে তাঁর অভিনয় অনেক পরিণত – সে কৃতিত্বের ভাগীদার কি গায়কও নন? আবার নৌকায় বসে বৈরাগীর মুখে ‘গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ’ শুনে তিনি বোনকে বলছেন – ‘ডাকতে হয় না রে, দরকার হলে উনি নিজেই আসেন’। এ ছবিতেও উত্তমের সাথেই আছেন হেমন্ত, কিন্তু তাঁর মুখের গানে নন – বরং জড়িয়ে আছেন, ছড়িয়ে আছেন ছবি জুড়ে।

‘সূর্যতোরণ’ ছবিতে ‘ওরা তোদের গায়ে মারবে লাথি’ যেন নায়কের প্রতিবাদী সত্তার সমর্থনেই কথা বলছে, কিন্তু গানটি গাইছে এক পথ-অভিনেতা। আবার উত্তম যখন সুচিত্রার গাড়ি চালাচ্ছেন, তাঁর অব্যক্ত প্রেমকে ভাষা দিচ্ছে গাড়ির মিউজিক সিস্টেম থেকে ভেসে আসা হেমন্তর গান – ‘তুমি তো জানো না।’ এ ছবিতে অন্য একটি গান অবশ্য উত্তমের মুখেই, ‘হোক না আকাশ মেঘলা’। ‘দুই ভাই’ ছবিতে উত্তমের লিপে দুটি গান গেয়েছেন হেমন্ত, বাকিগুলি বিশ্বজিতের লিপে, উত্তম শ্রোতা। ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’-এ গানগুলো গাইছেন ‘ছড়িদার’ অনিল চট্টোপাধ্যায়। পাগলের ভূমিকায় উত্তমকুমারের মনের গ্লানি কিন্তু অনেকটা প্রকাশ পায় অনিলের গানে গানে। ‘সূর্যতপা’ ছবিতে জহর রায়ের লিপে ‘কে যাবে কে যাবে’ গানটি হেমন্ত গাইছেন একান্তই ‘খোকাবাবু’র জন্য, তবে ‘সব কিছু বোঝান কি যায়’ গানটির শ্রোতা উত্তম, সঙ্গে সন্ধ্যা রায়। ‘ধন্যি মেয়ে’র গান দুটির ক্ষেত্রেও উত্তম সরাসরি শ্রোতার ভূমিকায় নেই।

‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ ছবিতেও প্রথম গানটি বাউলের কণ্ঠে – ‘তার অন্ত নাই গো’। রাইচরণরূপী উত্তমের মুখে তাঁর কোন গান নেই। কিন্তু উত্তমের অভিনয়ের সঙ্গতে ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যটিতে অসাধারণ আবহ রচনা করেছেন হেমন্ত। খোকাবাবুকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে রাইচরণ। ছবিতে এই দৃশ্যটি প্রায় ছ মিনিটের – দু-তিনবার ‘খোকাবাবু’ বলে ডাকা ছাড়া আর কোন সংলাপ নেই। আবহে সঙ্গীত পরিচালক ক্রমাগত বাজাচ্ছেন তারসপ্তকে বাঁধা বেহালা, বেদনার অভিব্যক্তির সঙ্গে ‘কি হয় কি হয়’ ভাব ফুটছে তাতে। এমনই অমোঘ সেই স্বরপ্রয়োগ – যে এতক্ষণ ধরে শুনতে একটুও একঘেয়ে লাগে না। তারপর যখন পাড় ভাঙছে উত্তাল নদীর ঢেউ, রাইচরণ বুঝতে পারছে যে খোকা তলিয়ে গেছে, তখন ওই আবহের সুরটিকেই নিজের গলায় তুলে আনেন হেমন্ত – সব হারিয়েও কেবল সুরসম্বল এক হাহাকারের মত শোনায় তাঁর কণ্ঠে চড়া পর্দায় ‘ম - গ ম গ র স’ হয়ে মধ্য সপ্তকে ‘ণ ধ প গ ম গ’…

সেই সঙ্গে রাইচরণের মুখে রিক্ততার অভিব্যক্তি মিলে যায় মর্মস্পর্শী দৃশ্যায়নে।

‘কমললতা’ ছবিতে শ্রীকান্তের (উত্তমকুমার) মুখে হেমন্তর গান নেই, এমনকি আর এক প্রধান চরিত্র গহর মিয়াঁর (নির্মলকুমার) মুখেও গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। হেমন্তের গানগুলি রাখা হয়েছে এক ‘খ্যাপা গোঁসাই’-এর মুখে। আপনভোলা মানুষ, তাঁকে দেখা যায় খুব কম; অথচ তাঁর গাওয়া কীর্তনের সুর সর্বত্র ভেসে বেড়ায়। বৈষ্ণব আখড়ার আপন-করা, প্রেমমাখা পরিবেশ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর গানে গানে। ‘ভজহুঁ রে মন’, ‘বনসন আওত নন্দদুলাল’, ‘নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ’, ‘এই না মাধবীতলে’ – গানগুলো ছাড়া কমললতার আখড়া ভাবা যায়? নেপথ্যে ‘দেখ সখি সাজিল নন্দকুমার’ গানটির অনুষঙ্গে শ্রীকান্ত আর কমললতা রাধাকৃষ্ণের জন্য মালা গেঁথে পরস্পরের দিকে তাকায় – তৈরি হয় এক মরমিয়া দৃশ্যপট। আবহে সেই এক ও অদ্বিতীয় হেমন্ত।

গানদুটি যেন উত্তমের অভিনীত চরিত্রটির উদ্দেশেই গাওয়া – ‘কালো আমার ভাল লাগে না’, আর ‘রাজা, যে টাকাটা মারছ ছুঁড়ে’।

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বললে উত্তমের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু উত্তম যখন ভোলা ময়রার চরিত্রে, অ্যান্টনির ভূমিকায় তখন বিশ্বজিৎ, আর তাঁর গলায় গেয়েছেন হেমন্ত। ছবির নাম ‘ভোলা ময়রা’। ‘ধনরাজ তামাং’ ছবিতে আবার পাই অন্য ধরনের যুগলবন্দি - হেমন্তকণ্ঠে ‘ধনরাজ তামাং একটি শুধু নাম’ গানটিও নামভূমিকায় থাকা মানুষটিকে পাহাড়ি উপকথার সঙ্গে একাকার করে দেয় নেপথ্যের সুরবিস্তারে।

এর পাশাপাশি মনে পড়বে ‘অগ্নীশ্বর’ ছবিতে ‘পুরানো সেই দিনের কথা’। গানটি যখন পর্দায় এল, বয়স্ক নায়ককে দেখতে আসা পুরনো বন্ধুদের মত দর্শকও নতুন করে ভাবতে বসল – বাইরে থেকে কড়া মেজাজি, বেপরোয়া, বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডাক্তারবাবুর মধ্যে অসহায় বিপত্নীকের প্রাণ এমন করে লুকিয়ে ছিল! পর্দায় গানটি গাইছেন অসীমকুমার। অথচ এ গানের অভিব্যক্তির পরতে পরতে

‘স্ত্রী’ ছবিতে উত্তমের লিপে গাইলেন মান্না দে, আর সৌমিত্রের লিপে হেমন্ত। ততদিনে নানা কারণে ঘটে গেছে উত্তম-হেমন্তর মধুর সম্পর্কে কিছু অনভিপ্রেত কালিমা-পাত। কেন জানি না এক আশ্চর্য সমাপতনের মতই মনে হয় এ ছবিতে হেমন্তর গাওয়া গানগুলির অন্তর্নিহিত বক্তব্য - বিশেষ করে জবাবি

খুলে যাচ্ছে উত্তম অভিনীত চরিত্রটির এক গোপন গভীর দিক।

এ ছবিতে আর একটি গানের প্রয়োগও অভিনব। ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ দেশাত্মবোধক দ্বিজেন্দ্রগীতি হিসেবেই প্রচলিত। কিন্তু এখানে ডাক্তার অগ্নীশ্বরের দেশভ্রমণ আর নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সূত্রে ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ হয়ে ওঠা – এক খাঁটি, উন্নত চরিত্রের দেশপ্রেমিক, সেবাব্রতীর চোখ দিয়ে দেশকে দেখার অনুভূতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই গানের অবিস্মরণীয় গায়নে। শেষ দৃশ্যে ডাক্তারের হাত কেঁপে ফুলগুলো পড়ে যাওয়া, উঠোনে লোকের ভিড়, তারপর পর্দা জুড়ে চিতা জ্বলে ওঠা – সবকিছুর সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মানিয়ে যায় গানটির শেষ স্তবক – ‘ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি / আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি’। সৌজন্যে সেই অনুপম কণ্ঠ – যার আবেদনে মৃত্যু হয়ে ওঠে অমৃত। উত্তমের অনবদ্য অভিনয় যদি এই অন্তিম দৃশ্যটির শরীর, তবে হেমন্তর গান তার আত্মা। প্রায় একই কথা বলা যায়

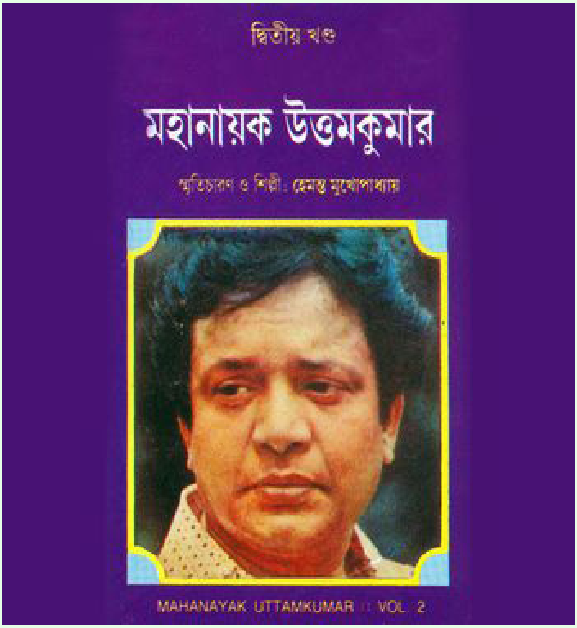

‘কাল তুমি আলেয়া’ ছবির ‘যাই চলে যাই’ প্রসঙ্গে। এ ছবির নায়ক তথা সুরকার ছিলেন উত্তম কুমার। ভাঙা সম্পর্ক ততদিনে আবার জোড়া লেগেছে কিছুটা – ‘ছোট ভাই’-এর সুরে গান গাইতে সানন্দেই রাজি হয়েছিলেন হেমন্ত। উত্তমের মুখে নয়, কিন্তু একটি মৃত্যুদৃশ্যের আবহ হিসেবে তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে এক অবিস্মরণীয় যুগলবন্দি রচনা করেছে এই গান। এবং, ‘হারানো সুর’-এর মতো এই গানটিও এক প্রয়াতা নারীর (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়) বিদায়বাণী। উত্তমকুমারের প্রয়াণের পর একটি অনবদ্য স্মৃতিচারণা–সহ গানের ডালি সাজিয়ে দিয়েছিলেন হেমন্ত – সেটি এইচএমভি-র রেকর্ডে, ক্যাসেটে অনেক উত্তম-হেমন্ত অনুরাগীই সংগ্রহে রেখে দিয়েছেন। তার শেষ গান ছিল ‘চৌরঙ্গী’ ছবির ‘কাছে রবে, কাছে রবে’ – খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে এই লেখার উপসংহারে এসে। পর্দায় গানটি গেয়েছেন বিশ্বজিৎ – কিন্তু এ গান যেন উত্তমের উদ্দেশেই গাইছেন হেমন্ত। দুই মহাব্যক্তিত্বের শেষ হয়েও শেষ-না-হওয়া সম্পর্কের চিরায়ত অভিজ্ঞান আর কী-ই বা হতে পারে!

***(কৃতজ্ঞতা :
অধ্যাপক প্রদোষ ভট্টাচার্য)***

হলে গিয়ে কখনও উত্তম কুমারের ছবি দেখেছেন!

উত্তম কুমারের নাম শুনলেই বাঙালি এমন একটা ভান করে, যেন কতই না জানে। অথচ, এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ফাঁকিবাজি রয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মের কথা ছেড়ে দিন। যারা মাঝবয়সী, তাদের জিজ্ঞেস করুন তো, উত্তমের কোনও ছবি হলে গিয়ে দেখেছেন কিনা। আমি নিশ্চিত, দশজনের মধ্যে অন্তত নজন দেখেননি। লিখেছেন রাজেশ মুখার্জি।।

উত্তম কুমারের নাম শুনলেই বাঙালি এমন একটা ভান করে, যেন কতই না জানে। অথচ, এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ফাঁকিবাজি রয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মের কথা ছেড়ে দিন। যারা মাঝবয়সী, তাদের জিজ্ঞেস করুন তো, উত্তমের কোনও ছবি হলে গিয়ে দেখেছেন কিনা। আমি নিশ্চিত, দশজনের মধ্যে অন্তত নজন দেখেননি।

হয়ত বলবেন, হলে ওইসব ছবি চলে না। চলে না কেন? আসলে, চললেও লোকে দেখতে আসবে না। এটা বুঝতে পেরেই হল মালিকরা চালান না। এমনকী এখন যে মাল্টিপ্লেক্সের রমরমা, সেখানেও উত্তমের ছবি নিয়ে সাতদিনের উৎসব হচ্ছে না কেন ? দেখি লোকে কেমন দেড়শো টাকার টিকিট কেটে ছবি দেখতে যায়!

হ্যাঁ, জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে নন্দনে প্রতিবছর চলে। আমরা কজন জানি? কজন দেখতে যাই? এতই যদি চাহিদা থাকত, তাহলে নন্দন টু-এর ছোট হলে কেন ? কেন

নন্দন ওয়ানে নয়? আসল কারণটা শিল্পী সংসদও জানে। হল ভর্তি তো দূরের কথা, অর্ধেক টিকিটও বিক্রি হবে না।

হাতে হাতে স্মার্টফোন ঘুরছে। সারাক্ষণ সবার চোখ মোবাইলে। আনলিমিটেড ডেটা। যত খুশি ডাউনলোড করছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, গত এক বছরে উত্তম কুমারের কটা ছবি ডাউনলোড হয়েছে? এতদিন না হয় ব্যস্ততার অজুহাত দিতেন। কিন্তু গত চার মাস ধরে লকডাউন চলছে। অধিকাংশ লোকের সামনেই অখণ্ড অবসর। খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, কজন উত্তম কুমারের কটা ছবি দেখেছেন? অথচ দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিন্তু মোবাইল হাতে বসেছিলেন।

না, দোষটা উত্তম কুমারের নয়। বদলে যাওয়া সময়ের এটাই প্রকৃত ছবি। কিন্তু এই সহজ ব্যাপারটা অনেকে মানতে চান না। তাঁরা ভাবেন, উত্তম কুমারের পর বোধ হয় বাংলা ছবিই হয়নি। এটা ভেবে তাঁরা কী আনন্দ পান, কে জানে। আসলে, তাঁরা এখনকার বাংলা ছবিও দেখেন না। উত্তমের ছবিও সেভাবে দেখেননি। ছোটবেলায় টিভিতে জুলাই মাস এলে হাতে গোনা কয়েকটা ছবি দেখেছেন। সেগুলোকেই ভাঙিয়েই স্মৃতির জাবর কাটছেন।

তার ছিঁড়ে গেছে কবে

উত্তম–সুচিত্রা। পরপর উচ্চারিত হয় নাম দুটো। প্রায় প্রবাদ হয়ে গেছে। কিন্তু একটু তলিয়ে পোস্টারগুলো দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন। অধিকাংশ ছবির পোস্টারেই কিন্তু উত্তম–সুচিত্রা নয়, লেখা আছে সুচিত্রা–উত্তম। অর্থাৎ, সুচিত্রার নাম আগে। এটাই নাকি সুচিত্রার শর্ত ছিল। নীরবে মেনেই নিয়েছিলেন মহানায়ক। লিখেছেন স্বরূপ গোস্বামী।

বাংলা ছবির রোমান্টিক জুটি বলতে কাদের বোঝায় ? এই প্রশ্নটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সবাই একটাই উত্তর দেবেন- উত্তম-সুচিত্রা। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো, এমন জুটির কথা কোনও ছবির পোস্টারে বা টাইটেল কার্ডে দেখেছেন কিনা। শুরুর দিকের কয়েকটা ছবিতে হয়ত উত্তম-সুচিত্রা পাবেন। কিন্তু অধিকাংশ ছবিতেই উত্তম সুচিত্রা পাবেন না। এখন তো ইন্টারনেটের যুগ। একটু সার্চ করলেই অনেক ছবির পোস্টার পেয়ে যাবেন। বা টিভিতেও মাঝে মাঝেই পুরানো ছবিগুলো দেখায়। আর এই ঢালাও নেটের যুগে মুশকিল আসান ইউটিউব তো আছেই। আরও ভাল করে ছবিগুলো দেখুন। টাইটেল কার্ডে সবার আগে সুচিত্রার নাম। আগে সুচিত্রা, পরে উত্তম।

এমনটা কেন হয়েছিল? পরিচালকরা কি তুকতাক বিশ্বাস করতেন? নাকি লেডিজ ফার্স্ট এর তত্ত্ব মেনে চলতেন? আসলে, এটা ছিল সুচিত্রার একটা শর্ত। পরিচালকদের কাছে তিনি শর্ত দিতেন, পোস্টারে আমার নাম উত্তম কুমারের আগে রাখতে হবে। উত্তম কুমার ক্রমশ মহানায়ক হয়ে উঠছেন। পরিচালক -প্রযোজকরা চাইছেন,

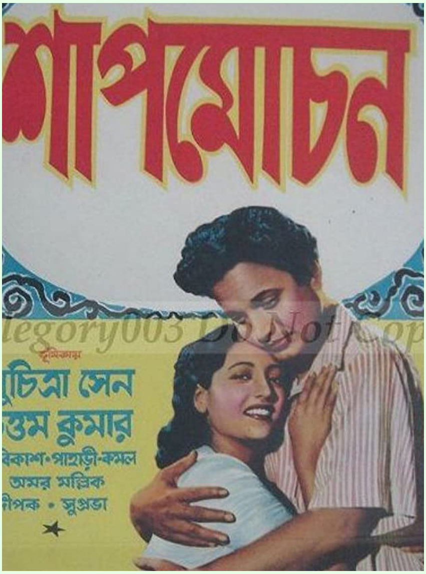

তাঁদের ছবিতে উত্তম কুমার কাজ করুন। তাঁকে ভেবেই চিত্রনাট্য লেখাও হচ্ছে। অথচ, সেই মহানায়ককে কিনা সুচিত্রার এইসব শর্ত মেনে নিতে হচ্ছে। অন্য কোনও নায়িকা যদি এমন শর্ত আরোপ করতেন, উত্তম কুমার নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে ছবি করতেন না। অন্য নায়িকা এমন শর্ত দেওয়ার সাহসও পেতেন না।

কিন্তু সুচিত্রা বরাবরই অন্যরকম। আর দশজনের সঙ্গে তাঁর অনেক ফারাক। তাই তিনি অবলীলায় শর্ত দিতেন, আমার নাম আগে দিতে হবে। আর উত্তম কুমারকেও সেই শর্ত হজম করতে হত। পরের দিকে আমরা ছবির টাইটেল কার্ডে একটা জিনিস দেখতে পাই। শুরুতে সুচিত্রার নাম। তারপর একের পর এক পার্শ্ব অভিনেতার নাম সবার শেষে লেখা 'এবং উত্তম কুমার'। এই 'এবং উত্তম কুমার'কে দেখে অনেকে ভাবতে পারেন, এটা উত্তম কুমারের নতুন কোনও স্টাইল। আসলে, তিনিও একটা সম্মানজনক রাস্তা খুঁজছিলেন। শুরুতে যখন সুচিত্রার নাম রাখতেই হবে, তারপরে কেন তিনি থাকবেন? তার চেয়ে বরং একেবারে শেষে 'এবং উত্তম কুমার' হওয়াই ভাল। তিনিও একটি পাল্টা কৌশল নিয়েছিলেন। সুচিত্রার পরে থাকুক পাহাড়ি সান্যাল, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, ছায়া দেবী, মলিনা দেবী-এসব নাম। সবার শেষে বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে হাজির 'এবং উত্তম কুমার'। একটা চমকও হল, আবার সুচিত্রার অহঙ্কারকে একটু 'শিক্ষা দেওয়া'ও হল।

কে বড়, সে তর্ক তোলা থাক। তবে উত্তম কুমারও বুঝতেন, তাঁর জনপ্রিয়তার অনেকটাই নির্ভর করছে সুচিত্রার উপর। অন্য নায়িকাদের সঙ্গে যতই ছবি করুন, বাঙালি সবসময় উত্তম--সুচিত্রাকেই দেখতে চেয়েছে। এই জুটিকে দেখার জন্যই সব কাজ ফেলে সে কাউন্টারের সামনে লাইন দিয়েছে। কিন্তু ছয়ের দশকের গোড়াতেই সুচিত্রার মাথায় ঢুকে গেল, উত্তমকে ছাড়াই তাঁকে স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতে হবে। তিনি যে একা একটা ছবিকে টানতে পারেন, তা দেখিয়ে দিতে হবে। বাষট্টিতে সৌমিত্রকে নিয়ে

করলেন সাত পাকে বাঁধা। সেই ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেল। সুচিত্রার অহমিকা আরও কিছুটা বাড়ল। তাঁর উত্তমকে দরকার নেই, এমন একটা বার্তা হাবেভাবে দিতে শুরু করলেন।

সেই জন্যই কি পরের দিকে উত্তমের সঙ্গে ছবির সংখ্যা কমে গেল? সুচিত্রা যে তাঁর নাম আগে লেখার শর্ত দিয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই নানা জায়গায় স্বীকার করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই বলেছেন, উত্তমের সঙ্গে আমার এত ছবি, কিন্তু আমি প্রোডিউসারকে বলেছিলাম, আমার নাম বিজ্ঞাপনে আগে দিতে হবে। তারপর সব ছবিতে 'সুচিত্রা-উত্তম', 'উত্তম-সুচিত্রা' নয়।

ওঁদের জুটির প্রথম ছবি সাড়ে চুয়াত্তর। মুক্তি পায় ১৯৫৩ সালে। সেই ছবি অবশ্য পুরোপুরি উত্তম--সুচিত্রার ছিল না। সেটা অনেক বেশি ছিল তুলসী চক্রবর্তী-মলিনা দেবীর ছবি। উত্তম- সুচিত্রার প্রথম হিট ছবি পরের বছর, অগ্নিপরীক্ষা। ৬ বছর চুটিয়ে দুজন অভিনয় করে গেলেন। একষট্টি সাল থেকে লক্ষ করে দেখুন। সুচিত্রাও ছবি কমিয়ে দিলেন। একষট্টিতে মুক্তি পেল একটাই ছবি- সপ্তপদী। বাষট্টিতেও একটাই ছবি- বিপাশা। দুটোতেই নায়ক উত্তম। এরপর পাঁচ বছরের ব্যবধান। ৬৭ তে উত্তমের সঙ্গে গৃহদাহ, ৬৯ এ কমললতা। তার দু বছর পর নবরাগ। উত্তমের সঙ্গে শেয় ছবি পচাত্তরে, প্রিয় বান্ধবী।

না, তারপর থেকে উত্তমের সঙ্গে আর কোনও ছবিই করা হয়নি সুচিত্রার। শেষ দু বছরে দুটি ছবি, দুটোই সৌমিত্রর সঙ্গে। ছিয়াত্তরে দত্তা, আঠাত্তরে প্রণয়পাশা। অনেকে ভাবেন, উত্তম কুমারের মৃত্যুর পরই বোধ হয় উত্তম-সুচিত্রা জুটির বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু সুচিত্রার ছবির তালিকাই বলে দিচ্ছে, শেষ ১৬ বছরে উত্তমের সঙ্গে ছবির সংখ্যা মাত্র ৬। শেষ পাঁচ বছরে একটিও ছবি নেই। উত্তম কুমার মারা গেছেন ১৯৮০ তে। তার দু বছর আগেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন সুচিত্রা। সিনেমা জগৎ থেকে অনেক দূরে, লোকচক্ষুর আড়ালে।

আরও একটা বিষয় লক্ষ করা দরকার। দুজনেই বম্বেতে নিজের নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। উত্তমও হাফডজনের উপর ছবি করেছেন। সুচিত্রাও প্রায় তাই। কিন্তু দুজন কখনও একসঙ্গে ছবি করার কথা ভাবেননি।

অবশ্য, এসব পরিসংখ্যান নিয়ে বাঙালি কখনই তেমন মাথা ঘামায়নি। সুক্ষ সুক্ষ অনুভূতিগুলো আম বাঙালির অ্যান্টেনায় কখনই সেভাবে ধরা দেয়নি। তাঁরা উত্তম-সুচিত্রা জুটি বলতেই অজ্ঞান।। উত্তম-সুচিত্রা বলতে তাঁদের কাছে 'হারানো সুর', সপ্তপদী বা সাগরিকা। সবই পাঁচের দশকের শেষ, অথবা ছয়ের দশকের গোড়ার ছবি। কিন্তু তারপর! শেষ আঠারোটা বছর! সম্পর্কের সেই তারটা বোধ হয় অনেক আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল।

কেন যে মহালয়া করতে গেলেন!

একবারই মহালয়া করেছিলেন উত্তম কুমার। সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা? বাংলার সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে কীভাবে দেখেছিলেন? কেন ক্ষমা চাইতে হল আকাশবাণীকে? এসব অজানা কথা উঠে এল দিব্যেন্দু দে-র কলমে।

আমি উত্তম কুমারের একজন অনুরাগী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখেছি। অন্যরা যেমন লাইন দিয়ে টিকিট কেটে তাঁর ছবি দেখিছিলেন, আমার তেমন সৌভাগ্য হয়নি। কারণ, আমার জন্ম তাঁর মৃত্যুর পর। তাই আমার উত্তম কুমারকে চেনা মূলত টিভির হাত ধরেই।

ছোট থেকেই শনিবার টিভিতে উত্তম কুমারের সিনেমা। না জেনে, না বুঝেই ভালবেসে ফেলেছিলাম ওই মানুষটাকে। বাকিরা কে কেমন, কে পরিচালক, কে নায়িকা বা কে গান গাইছেন, সেগুলো নিয়ে ভাবতামও না। মনে হত উত্তম কুমারই বোধ হয় সিনেমার কাহিনী লিখেছেন। তিনি নিজেই গান গাইছেন।

পরে একটু একটু করে জানতে শুরু করলাম মানুষটাকে। শুরুর দিকে কীভাবে লড়াই করতে হয়েছিল, শুনেছি। বম্বেতে গিয়ে কীভাবে

স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, তাও শুনেছি। আমি একটি বিশেষ দিকের কথা তুলে ধরব, যা এখনও সেভাবে আলোচিত হয়নি।

সাতের দশকে উত্তম কুমারকে দিয়ে একবার মহালয়া রেকর্ড করানো হয়েছিল। মহালয়া বলতেই আমরা চিরকাল শুনে এসেছি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর সেই উদাত্ত কণ্ঠ। ১৯৩৫ থেকে যার যাত্রা শুরু, এখনও সমান জনপ্রিয়। একবারই ব্যতিক্রম হয়েছিল, সেটা ১৯৭৬

সালে। আকাশবাণীর কর্তারা চেয়েছিলেন মহালয়াকে আরও জনপ্রিয় করতে তুলতে। মহানায়কের জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বী। তাঁকে দিয়ে যদি রেকর্ড করানো যায়!

প্রস্তাব এল উত্তম কুমারের কাছে। এমনিতে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে সবসময়ই ভালবাসতেন। কিন্তু এইক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধা ছিল মহানায়কের। বাঙালির অন্য কণ্ঠস্বর শুনে অভ্যস্থ। সেই কণ্ঠই বাঙালির কানে বাজছে। হঠাৎ নতুন এই চেষ্টাকে মানুষ আদৌ গ্রহণ করবে তো? ভরসা দিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনিই ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক।

ঠিক হল, বাণীকুমার লিখবেন। হেমন্ত সুর দেবেন। উত্তম পাঠ করবেন। বেশ কয়েকদিন মহড়া হল। বাড়িতে সংস্কৃতের মাস্টারমশাই রেখে সংস্কৃত উচ্চারণ শুদ্ধ করলেন। মহালয়ার দিন রেকর্ডিংও হল । মহিষাসুরমর্দিনীর বদলে নাম রাখা হল দুর্গেদুর্গতিহারিনী। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সেই মহালয়াকে বাঙালি মোটেই ভালভাবে গ্রহণ করেনি। চারিদিকে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। তখন সোশাল মিডিয়া ছিল না। কিন্তু চায়ের ঠেক, পাড়ার সেলুন, পুকুর ঘাট এগুলোই ছিল সোশাল মিডিয়া। দ্রুত ছড়িয়ে গেল, উত্তম কুমার একেবারেই করতে পারেনি, ঝুলিয়েছে। উত্তম বিরোধীরা বলতে লাগলেন, ‘যার কাজ তাকেই মানায়। যাকে তাকে দিয়ে কি মহালয়া হয়?’ ধার্মিক লোকেদের কেউ কেউ ক্ষেপে গেলেন, তাঁরা আকাশবাণীর সমালোচনা করতে লাগলেন। শোনা যায় প্রচুর চিঠি ও ফোন এসেছিল ক্ষোভ জানিয়ে। বাধ্য হয়ে আকাশবাণীকে ক্ষমা চাইতে হল। এমনকি উত্তম কুমারও ক্ষমা চাইলেন। জানিয়ে দিলেন, এটা করা তাঁর উচিত হয়নি। আগামীদিনে আর তিনি মহালয়া রেকর্ড করবেন না।

আর কখনই তিনি মহালয়া রেকর্ড করেননি। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৭৭ থেকে আবার সেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরই শুনে আসছে বাঙালি। উত্তম কুমারের জীবনে নিঃসন্দেহে এটা একটা ব্যর্থ চেষ্টা। অনেকেই বলেছেন, এটা ততটা খারাপও হয়নি। আসলে, বাঙালির কান বীরেন্দ্রকৃষ্ণর চণ্ডীপাঠ শুনতেই অভ্যস্থ ছিল। তাই নতুন এই মহালয়াকে তারা গ্রহণ করতে পারেনি।

তবু যাঁরা উত্তম কুমারের কণ্ঠে সেই মহালয়া শুনতে চান, তাঁদের জন্য ইউ টিউব লিঙ্ক দেওয়া হল। চাইলে শুনতে পারেন। https://www.youtube.com/watch?v=--YqGHZBvjBI

বেঙ্গল টাইমস

২৪ জুলাই, ২০২৬

এখনও উত্তম

ISSN 2445-5657 | bengaltimes.in